গ্লানি

বিমল কর

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

কণা বসুমিশ্র

কল্যাণীয়াসু

এই লেখকের অন্যান্য বই

শেষবেলার গল্প

পুনশ্চ ও অনাবৃত

নতুন তারা

সোহাগ

কৃষ্ণকথা

দেওয়াল ইত্যাদি

গ্লানি

গ্লানি

"গলা শুনিয়া বুঝিতে পারি, কবুতরী গান গাহিতেছে। গান গাহিবার গলা তাহার নয়। ভাঙা, মন্দাটে গলা। তবু কবুতরী গাহিতেছে, 'ধোপিয়া কি বিটিয়া রে ধোপিয়া কি বিটিয়া।' ধোপিয়ার বেটি হাটিয়ায় গিয়া কত রকম রঙ্গ করে তাহার রসালো বৃত্তান্ত গাহিয়া কবুতরী তাহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেছিল। গানের সহিত ঢোলক বাজিতেছে, ঝম্প ঝমঝম করিতেছে। ধুয়া উঠিতেছিল, 'লে চালে যা সা রা রা।'

গোপীজীবন মল্লিক ডায়েরি লিখতে লিখতে একটু থামল। সামনের দিকে তাকাল। পার্টিশানের একপাশে সামান্য ফাঁক। অন্য সময় চিট পরদা ঝোলে, এখন গোটানো ছিল। ওপাশে একটি বেঞ্চি। চার ছ'হাত ফাঁকা জায়গার শেষে সিঁড়ির ধাপ। সিঁড়ি নামলেই কাঁচা নালা, তারপর গলি।

গোপীজীবন ভেবেছিল, কেউ বুঝি এসেছে। কেউ নয়।' কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, যেন ভাবল কিছু, সিগারেট ধরাল কলমটা ঝেড়ে নিল একবার, কালি আছে এখনও, তারপর আবার লিখতে লাগল:

'ধানসার মহললায় হোলির মরশুম চলিতেছে। আর মাত্র তিনটি দিন; তাহার পরই হোলি। এই পিপলি গলিতে সন্ধ্যা হইতেই হোলির হললা শুরু হয়। দশ বিশ অন্তর একটি করিয়া আখড়া। কবুতরীর আখড়াটি আমার নাকের ডগায়। তাহার গান আমি শুনিতে পাইতেছি। গানের সহিত সে যে নাচিতেছে তাহাও আমি অনুমান করিতে পারি। কবুতরীকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে এক পোয়া নেশা করিলে পানের পিক ফেলে ও হাসে; দু পোয়া নেশায় তাহার নাচ শুরু হয়। তিন পোয়া নেশায় থাকিলে টুলুয়া সেপাইয়ের জন্য হাউমাউ করিয়া কাঁদে। ....আর চার পোয়া নেশা করিলে আমার ডাক পড়ে। মাগী তখন বেহুঁশ, গলগল করিয়া ঘামে। নুন আর ইমলির জল ঘটি করিয়া তাহাকে

খাওয়াইতে হয়। ...কবুতরী আজ এখন পর্যন্ত দু পোয়াতে আছে, তাহার নাচগান চলিতেছে, কিন্তু তাহার গলা শুনিয়া বুঝিতেছি—আর বেশিক্ষণ নয়।'

পায়ের শব্দে গোপীজীবন মুখ তুলল।

করালী শিকদার। বানোয়ারী ট্রান্সপোর্টের খাতাবাবু। কেরানির কাজ করে।

'আপনি একলা ডাক্তারবাবু?'

'একলাই।'

'যুগল কোথায় গেল?'

'ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেছে। ওর মা দেওঘর যাবেন, ট্রেনে তুলে দেবে।'

করালী সামনে এসে দাঁড়াল। করালীর চেহারা ঝোড়ো কাকের মতন. মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো, জামার হাতা ছেঁড়া, ময়লা ধুতি. পায়ে চপ্পল। মানুষটার দুটি চোখ যেন কালো কালো দুই গর্তের মধ্যে ডুবে আছে।

করালী হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল. 'একটা টাকা হবে ডাক্তারবাবু? পরশু ফেরত দিয়ে দেব।'

গোপীজীবন মাথা নেড়ে না বলতে যাচ্ছিল, কী মনে করে বলল, 'এক টাকায় কতটুকু গাঁজা হয় করালী?'

করালী জিব কেটে কান ধরল। তারপর হাত নাড়তে লাগল। 'গাঁজা নয় ডাক্তারবাবু। মাইরি বলছি গাঁজা নয়। কালীর দিব্যি। সরমার জন্যে দুটো গজা কিনে নিয়ে যাব। মতি হালুই—শালা এখন আট আনা করে গজার পিস করেছে। তাও এইটুকু সাইজ। ...সরমার এখন ইয়ে চলছে। সে আবার গজাটা ভালবাসে। গজা বালুসাই...। কত বলেছি—ভাড়া লরির অফিসে কাজ করি... তোমার জিবের তোয়াজ...।'

গোপীজীবন পকেট থেকে টাকা বার করল।

'তুমি এক কুমিরছানা আর কতকাল দেখাবে করালী ?'

'না না, বিশ্বাস করুন। বউ বড় পাজি জিনিস ডাক্তারবাবু। তারপর এ হল বাপ-মা মরা মেয়ে…। চোখের জল লেগেই আছে।'

টাকাটা দিয়ে দিল গোপীজীবন। মাঝে মাঝেই দিতে হয়। তবে ওই এক টাকাই, দু টাকা, চার টাকা সে চায় না। চাইলেও কদাচিৎ।

করালী টাকা নিয়ে বুক পকেটে গুঁজলো। 'পরশু ফেরত পাবেন।'

'অনেক পরশুই তো গেছে করালী।'

'এবার মায়ের দিব্যি। …আজ আপনার রোগী নেই ?'

'না।'

'আটটা বাজতে চলল। এরপর আর কখন…'

'আজ আর আসবে মনে হয় না। হোলি চলছে।'

'এ বেটাদের এই এক…। চলি ডাক্তারবাবু।'

করালী চলে গেল।

গোপীজীবন বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে চলল। রোগী আসার আশা আর নেই। এ সময় বড় একটা আসেও না। সন্ধের গোড়াতেই যা ভিড় হয় সামান্য। তার ওপর এখন হোলি নিয়ে সব মত্ত। নেহাত দায়ে না পড়লে কেউ দাবাইখানায় এসে বসে থাকতে চায় না।

আজ নিজের ডিসপেনসারিতে আসার পর গোপীজীবন মাত্র তিনজনকে বসে থাকতে দেখেছিল। অবশ্য সে দেরি করেই এসেছে আজ। অন্যদিন পাঁচটা নাগাদ চলে আসে, আজ ছ'টা বেজে গিয়েছিল।

সামান্য অন্যমনস্কভাবেই বসে থাকল গোপীজীবন। ঠিক এখন তার বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। বকুলের অসুবিধে হবে। বকুল এক গানের মাস্টার রেখেছে। সন্ধে হলেই পাজামা পাঞ্জাবি গায়ে

চাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে হাজির হয় বিলুমাস্টার। এদিককার পয়লা নম্বর ওস্তাদ। প্রায় মাইল দশেক এলাকা তার দখলে। সন্ধে বেলায় বিলুমাস্টার, হপ্তায় তিনদিন। আর দুপুরে আসে সেলাই মাস্টার। তারও তিনদিন। কী হয় এত মাস্টারে কে জানে। বকুলের শখ। তার বাবা মেয়ের জন্যে মোটামুটি একটা কিছু গচ্ছিত করে গেছে বলে বকুলের এইসব শখটখ মিটছে। কিংবা এসব না থাকলে বকুল হয়ত অন্যরকম কিছু হয়ে উঠত। এমনিতেই সে গোপীজীবনকে তেমন একটা গ্রাহ্য করে না। স্বামী হিসেবে আছ, থাকো। তার বেশি নয়। তোমায় যদি মনিব হিসেবে গায়ে মাখতে হয়— তবে আমার এবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।

গোপীজীবনের খেয়াল হল কলমটা খোলাই পড়ে আছে। কালি বুঝি শুকিয়ে গেল নিবের।

নিবটা দেখল গোপীজীবন। হাত ঝাড়ল।

গোপীজীবন যে রোজই ডায়েরি লেখে তা নয়। মাঝে মাঝে লেখে। ইচ্ছে হলে লেখে, মনে কথা জমলে লেখে বা অবসর থাকলে সময় কাটাতে লেখে।

আজ তার অবসর রয়েছে। আর লেখার মতন কথাও আছে।

গোপীজীবন আবার কলম তুলে নিল। লিখতে লাগল ঃ

'আজ আমি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম কে জানে। বকুলের মুখ নয়, তাহার মুখ দেখার সৌভাগ্য হয় কই। বকুল ঘরে ছিল না। যাহার মুখই দেখি না কেন, বেশ খানিকটা বেলায় মহেশবাবুর বাড়ি হইতে চিঠি লইয়া লোক আসিল। চিঠি পড়িয়া আমি অবাক। বিশ্বাস হইতেছিল না। মুখার্জিবাবু আমায় তলব করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে হইবে। আজ বিকালে হইলেই ভাল হয়।

'মহেশবাবুর স্ত্রীকে আমি দেখিতে যাইব। অবাক হইবারই কথা বটে। মহেশবাবু এখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই শহরে

তাঁহার তিন চারিটা বাড়ি, ভাড়া খাটান, কেরাসিন তেলের ডিলার, বাজারে একটি সাইকেলের দোকান আছে 'জয়হিন্দ সাইকেল স্টোর্স'। শহরের বাহিরে কিছু জমি জায়গা বাগান আছে। ধনী মানুষ। এবং গণ্য মানুষ। আমাদের সুলতানপুরের মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বেংগলি ক্লাব—যেখানে যাহা আছে তাহার এক একটি চেয়ার দখল করিয়া আছেন। কোথাও তিনি প্রেসিডেণ্ট, কোথাও ভাইসপ্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী। এখানে মহেশবাবুদের তিন পুরুষের বাস। কাশী হইতে পূর্বপুরুষরা আসিয়াছিলেন। আমি মহেশবাবুকে 'কাশীর ল্যাংড়া' বলি। মাটি বদল হইলে কী হইবে—বনেদি গন্ধের অবশিষ্ট কিছু আছে বই কি।

মহেশবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁহারই ইয়ার দোস্ত স্যান্ডেলমশাই। বয়স্ক, অভিজ্ঞ, কলকাতার পাস করা ডাক্তার। তাঁহার বড় চেম্বার, নিজের গাড়ি, একটি ওষুধ-পত্রের দোকান। স্যাণ্ডেল ডাক্তারই তো ও-বাড়ির চিকিৎসা করেন। তবে আমায় কেন?

রামযশ সিনহা বলিয়া এক ছোকরা এখানে হালে বেশ পশার জমাইয়াছে। সে পাটনার পাস করা। চটপটে ছোকরা। হাসি-হাসি মুখ। নিজের হাতেই রোগীকে সুঁই মারে। রামযশকেও বা কেন তলব করা হইল না?

'আমি টাকাপয়সা দিয়া ওঁচা জায়গা হইতে একটা কাজ চলা গোছের ছাড়পত্র লইয়াছি ইহা সকলেই জানে। জানে যে, আমি পিপলি মহললার খারাপ মেয়েছেলে এবং টাঙাঅলা সবজিঅলা মুটে মজুরের চিকিৎসা করি। আমার আবার দু-মুখো চিকিৎসা। অ্যালাপাথি হোমিওপ্যাথি দুইই। কবিরাজী কোনো কোনো দাওয়াইও লিখিয়া দি। আমার চিকিৎসার বেশির ভাগটাই দেহাতি। ভিজিটও কম। অ্যালাপাথি চার টাকা, হোমিওপ্যাথি দুটাকা। এক দফায় মাত্র একবার ফি লই। ওষুধের দাম অবশ্য যখন যেমন তেমন দিতে হয়।

'মহেশবাবুর স্ত্রীকে দেখিবার সৌভাগ্য কি হেলায় হারানো যায়? লিখিয়া দিলাম বিকালে যাইতেছি, পাঁচটা নাগাদ।

'মহেশবাবুর বাড়িতে বার দুই চার গিয়াছি মাত্র। যথা সময়ে হাজির হইয়া দেখি, তিনি নিজের বৈঠকখানা ঘরেই আছেন।

'বাবু বলিলেন, 'এই যে মল্লিক। তোমার জন্যেই বসেছিলাম। চলো, রোগী দেখবে চলো।'

'দোতলায় আসিয়া মহেশবাবু বার দুই হাঁক দিলেন। বাড়ির দাসদাসীদের বোধহয়। পরে আমায় বলিলেন, 'আমার একটা জরুরি মিটিন্ আছে। ছ'টার মধ্যে পেঁছিতে হবে। তুমি একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবে হে। পাঁচের বোঝা বইতে বইতেই সময় কেটে যায়, বুঝলে কিনা।' মহেশবাবু মিটিংকে মিটিন্ বলেন, স্টেশনকে টিশন, মাছকে মছলি, দইকে দহি—এই রকম অনেক কিছু। 'বুঝলে কিনা' বলাটা তাঁহার মুদ্রাদোষ।

'রোগিণীর ঘরে আসিলাম। মহেশবাবুর স্ত্রী বিছানায় শুইয়া আছেন। চোখের পাতা আধবোজা। ঘরে ইউকেলিপটাসের গন্ধ। বিছানার সামনে একটি গোল টেবিলের উপর আইসব্যাগ, জলপটির পাত্র, জলের গ্লাস, হাতপাখা। মাথার দিকের এক টেবিলে নানা ধরনের ওষুধের শিশি। একটি দাসী কাছেই দাঁড়াইয়া আছে।

'মহেশপত্নীকে আমি এই প্রথম দেখিতেছি না। আগেও দেখিয়াছি। সুন্দরী স্ত্রীলোক। মহেশবাবুর দ্বিতীয়পক্ষ। বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। মহিলাকে খুবই শীর্ণ দেখাইতেছিল, মাথায় চুল রুক্ষ, জট-পড়া। সারা মুখ যেন ছাই লেপা। গলা আর কপালে দু-তিনটি বিষফোড়ার মতন ঘা।

'রোগিণীকে দেখিলাম। দু পাঁচটি প্রশ্নও করিলাম। মহিলার তখনও একশোর উপর জ্বর। সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। মাথা ছিঁড়িয়া যাইতেছে।'

'মহেশবাবুর দৃষ্টি বলিতেছিল, মল্লিক একটু তাড়াতাড়ি করো।

'বাহিরে আসিয়া মহেশবাবুকে বলিলাম, আগে কী চিকিৎসা হচ্ছিল জানতে পারলে…

'সব রকম। কিছু বাদ যায়নি।'

'তিন হপ্তা ধরে একটানা জ্বর?'

'একটানা। ওপরে চার পাঁচ, নিচে শ।'

'মুখে গলায় ঘা দেখলাম।'

'মাঝে মাঝে হয়। এবার একটু বেশি হয়েছে। গায়েও আছে।'

'বলছিলেন, দিনে চার পাঁচবার বমি করেন।'

'করে। পেটে কিছু রাখতে পারে না। …মল্লিক, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে; মিটিন্। …ওর পেটটাকে যদি সামাল দিতে পার—কাজ হয়।'

মহেশবাবুর আর অপেক্ষা করা চলে না।

'আমি চলিয়া আসিলাম। বলিয়া আসিয়াছি, একটু ভাবিয়া দেখি আগামীকাল হইতে ওষুধপত্র শুরু করিব।

'মহেশবাবুর স্ত্রীর কথাই ভাবিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম, মহেশ-বাবুর কথায় 'ওর পেটটাকে যদি সামাল দিতে পার,—কাজ হয়।' —গূঢ়ার্থটি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মহেশবাবুরা নিঃসন্তান। তবে কি—? দেখিলাম—কবুতরীর গান আর পিপলি মহল্লার হোলির যেরকম হল্লা চলিতেছে তাহাতে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবা যায় না। অসম্ভব।'

গোপীজীবন মুখ তুলল আবার।

কেদার বোস।

'কী ডাক্তার। এখনও আছ? করছ কী?'

গোপীজীবন ডায়েরী খাতা বন্ধ করল। 'তেমন কিছু নয়।'

'হিসেব দেখছিলে নাকি? বকেয়া পাওনার হিসেব…'

'ওই…।'

'তোমায় একটা খবর দিতে এলাম। পরেই দিতাম। তোমার ঝাঁপ খোলা রয়েছে দেখে ঢুকে পড়লাম।'

'কী খবর?'

'ভূতনাথ সুসাইড করেছে।'

গোপীজীবন চমকে উঠল। কেদারকে দেখছিল। বিমূঢ়। পাতা পড়ছিল না চোখের। 'সুসাইড! আত্মহত্যা! ···কবে করেছে? কোথায়?'

'শুনলাম রাজপুরায় একটা রেল কোয়ার্টারে উঠেছিল। সেখানেই গলায় দড়ি দিয়ে লটকে গেছে। ···শুনে পর্যন্ত···কী বলব বলো। বাচ্চা একটা ছেলে। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোর যে কী হয়!'

গোপীজীবন চুপ। অন্যমনস্কভাবে ডানদিকে দেওয়ালের দিকে তাকাল। ভূতনাথ একটা ছবি এঁটে দিয়ে গিয়েছিল জোর করে। ক্যালেণ্ডারের ছবি। ছবির ওপাশে ছোট্ট জানালা। জানলার ওপরে অন্ধগলি আর ডুমুরগাছ। কবুতরীর গান থেমে আসছিল ক্রমশ।

দুই

গোপীজীবন ঘুমিয়ে পড়েনি, চোখ বুজে শুয়েছিল।

বাতি নিভিয়ে বকুল বিছানায় এল। শোবার আগে সে মাথার চুল গোছ করে, মুখ পরিষ্কার করে, এক রাশ পাউডার ঢালে গায়ে গলায়—তারপর শুতে আসে। শীত আর নেই। শীত থাকলে বকুল গ্লিসারিনের শিশি নিয়ে বসত। হাত পা মুখ গাল গলা মোলায়েম করতে করতেই তার ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যেত। এখন

গরম পড়ছে, শেষ রাত আর ভোরের বাতাসেই যা সামান্য শীত-শীত ভাব থাকে।

গোপীজীবন অন্ধকারে চোখ খুলল না প্রথমে। চোখ খুললেও ঘন অন্ধকার দেখত না, পায়ের দিকে আর বাঁ পাশের খোলা জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার আভা আসছিল। আজ বোধহয় একাদশী কি দ্বাদশী তিথি, দু-তিনদিন পরেই দোল।

বকুল বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে। কী যে তার অস্বস্তি হয় কে জানে। নড়েচড়ে, পাশ ফেরে, মাথার বালিশ সরায়, পাশ-বালিস নিয়ে কখনও ডাইনে ফেরে, কখনো বাঁয়ে। মাঝে মাঝে আবার হুট করে উঠে চলে যায় পাশের ঘরে। পাশের ঘরেও তার একটা আলাদা বিছানা পাতা থাকে। ঘরটা অবশ্য ছোট। এই ঘরটা কিন্তু ছোট নয়, বরং বড়ই, আর জোড়া খাটটাও চওড়া, দুজনে শোবার পক্ষে যথেষ্ট।

বকুলই কথা বলল হঠাৎ, 'মহেশবাবুর বউকে দেখলে ?'

গোপীজীবন কোনো জবাব দিল না। সে বুঝতে পারেনি বকুল হঠাৎ মহেশবাবুর স্ত্রীর কথা তুলতে পারে এ-সময়।

'কী হল ? ঘুমোচ্ছ ?'

'না।'

জবাব দিলেনা কথার।

'দেখেছি।'

'কী হয়েছে ওর ?'

গোপীজীবন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলতে পারছি না। ভাবছি।'

বকুল সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরল। দেখল স্বামীকে। 'ভাবছ ! রোগী দেখলে কোন বিকেলে, আর এখনও ভাবছ ?'

গোপীজীবন জবাব দিল না।

বকুল বলল, 'ভাবতেই যদি দিন কেটে যায় চিকিৎসা করবে কবে ?

'কেমন ডাক্তার তুমি!' রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল বকুল। পাশ বালিশটা পায়ে করে সরিয়ে দিল। 'ডাক্তাররা রোগী দেখে আর চটপট ওষুধ দিয়ে দেয়; তাদের যদি আজ রোগী দেখে কালকে ভেবে পরশু ওষুধ দিতে হত—রোগী মরে যেত।'

গোপীজীবন বলল, 'মহেশবাবুর বউয়ের সেইরকম চিকিৎসাই চলছিল ··, চটপট। ধর তক্তা মার পেরেক···। স্যান্ডেল দেখছিল। কই কিছু তো হয়নি।'

'হয়নি। তোমাকে দিয়ে হবে?'

'কী জানি।'

বকুল বিছানার মধ্যে সামান্য অস্থির ভাব দেখাল। তারপর বলল, 'তুমি যে কী। ভগবান জানেন তুমি কোন্ ডাক্তারি শিখেছ। ভদ্দরলোকের ডাক্তার হতে পারলে না, যতসব ছোটলোক আর নোংরা মেয়েগুলোকে নিয়ে তোমার ডাক্তারি। ছি ছি! লোকে যখন বলে, ও তো অমুক মহললার ডাক্তার, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।··'

গোপীজীবন বলল, শান্তভাবে, 'ওরাও আমায় পয়সা দেয়।'

'সে আমার জানা আছে। ক-ত পয়সাই দেয়। দিনে তো তোমার পঞ্চাশটা টাকাও রোজগার নেই। ওদিকে ওদের দেখো—এক একজন গাড়ি বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলেছে। তোমার শুধু মুখ। আর বেঁকা বেঁকা কথা।'

'মুখ নেই তো কথা।'

'ন্যাকামি করো না। ···তুমি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাও মারো—আমার পায়ে কুড়ুল মারবে না। আমারও মান-সম্মান আছে।' বলে বকুল যেন দু মুহূর্ত থামল, তারপর বলল, 'হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে না। মহেশবাবুর বউকে তুমি যেমন করে হোক সারিয়ে তুলবে। ···কান টানলে মাথা আসা—সে বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে থাকা দরকার।'

গোপীজীবন ঠাট্টার গলায় বলল, 'আমার ঘট একেবারে ফাঁকা নয়। ঘটের মধ্যে তুমি আছ। মহেশবাবুর বাড়িতে মাথা গলাতে পারলে যোগেনবাবু, কচি সামন্ত, হাজরা সাহেব—একে একে বড় বাবুদের....'

'তুমি আমায় ঠাট্টা করছ?'

'একেবারেই নয়।'

বকুল, যেন পা ছুঁড়ে পাশ বালিশটা আরও ঠেলে বিছানার পায়ের দিকে করে দিল। তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। রাগ চড়ে উঠলে বকুল কোনো কিছুর পরোয়া করে না। মুখ আগলাতে সে ভুলে যায়, গলার স্বর কোথায় উঠছে—তাও খেয়াল রাখে না। এমন কি বকুল হাত পা সামলাতেও পারে না। হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ে, খিমচে দেয় গোপীজীবনকে, এমনভাবে পা ছোঁড়ে যেন সে একটা লাথিই মারতে চাইছে।

'আমি ঠাট্টা বুঝি না।' বকুল যেন উঠে বসরে বিছানায়, 'আমাকে তুমি এতোয়ারির মা ভেবেছ। ভদ্দরলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বললাম, আর তুমি আমায় ঠাট্টা করছ। ....করবে না কেন? যার যেমন স্বভাব। গায়ের ছাপ কি লোকে সহজে তুলতে পারে!'

গোপীজীবন বিরক্ত হলেও চুপ করে থাকল প্রথমে। বকুলের মুখ থেকে ওইসব কথা, একই কথা সে এতবার শুনছে, শুনতে হয় যে এখন আর তার আলাদা করে গায়ে লাগে না। সয়ে গিয়েছে। কার গায়ে কিসের ছাপ গোপীজীবন যেমন জানে—বকুলেরও জানা উচিত। চুপ করে থেকে শেষে বলল, তোমার বাবা যদি সেটা বুঝতে পারতেন—।'

বকুল রাগে জ্বলছিল। 'বাবা যে কত বড় ভুল করেছিল। ···তোমার মতন একটা মানুষ যার না চালচুলো না শিক্ষাদীক্ষা, লোভী চালাক···'

'বকুল !'

'কিসের বকুল ?'

'অযথা ঝগড়া করো না। আমি তোমায় কিছু বলিনি।'

বকুল এবার বিছানায় উঠে বসল। মানে সে হয়ত আর এ ঘরে থাকবে না, পাশের ঘরে চলে যাবে।

বকুল বলল, 'ঝগড়া আমি করছি ? তুমি আমাকে—'

'থামো। ভাল লাগছে না।'

'লাগছে না তো সেখানে যাও যেখানে ভাল লাগবে। আমার পাশে শুয়ে আছ কেন ?'

গোপীজীবন জানলার দিকে পাশ ফিরল। তারপর নিজের মনেই যেন বলছে, বলল, 'রাত্তিরে একটু চুপচাপ থাকার উপায় নেই। মনটা একেই খারাপ, শুয়ে আছি, ভাবছি আর শুরু হয়ে গেল।'

বকুল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর ওপর। 'কিসের মন খারাপ তোমার ?' গোপীজীবনের কাঁধের কাছটায় প্রায় খামচে ধরল, 'কিসের মন খারাপ ? কার জন্যে মন খারাপ ! সেই মাগীটার জন্যে ? কালোজামের মতন চোখ, দশাসই চেহারা, মোষের মতন পেছন করে হাঁটে··· ছি ছি'

গোপীজীবন ঝাপটা মেরে হাত বাড়িয়ে দিল স্ত্রীর। বলল, 'না। তোমার হাঁটাটাই বা কম কিসের। তার তো কালোজামের মতন চোখ, তোমার চোখ তো খোসা ছাড়ানো লিচুর মতন—কী যে বলছে গোপীজীবন খেয়াল করল না। না করেই বলল, 'মাগীর কথা ভাবিনি—ভাবছি ভূতনাথের কথা। ভূতনাথ আত্মহত্যা করেছে।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন থমকে গেল সব। বকুল কেমন এক শব্দ করল। একেবারে আচমকা এমন কিছু ঘটে গেল যেন—যা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ এই ঘটনার আকস্মিকতায়

চমকে উঠতে হয়, বিমূঢ় হতে হয়। বকুল নিঃসাড়। ক্রমশ কেমন এক স্তব্ধতা আর শূন্যতার ভাব যেন এই ঘরের মধ্যে জমে উঠতে লাগল।

বকুল হতবাক, বিহ্বল। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে এমনভাবে বসে থাকল যেন তার কোনো চেতনা নেই।

গোপীজীবনও কথা বলছিল না।

কিছুক্ষণ পরে বকুল বলল, অবিশ্বাসের মতন করে, 'কে বলল?'

,কেদার বোস।'

'কখন বলল?'

'ডিসপেনসারিতে। আমি যখন উঠে আসছি—তখন এসে বলল।'

বকুল কী যেন ভাবল, 'সে কেমন করে জানল? দেখেছে?'

'না। শুনেছে। ···রাজপুরায় একটা রেল কোয়ার্টারে ভূতনাথকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা গেছে। তাই বলল।'

বকুল কেমন আবার শব্দ করল। আতঙ্কের। হঠাৎ দুহাতে নিজের মুখ আড়াল করল। চোখ বোজা। চোয়াল আর দাঁত এমন শক্ত হয়ে গেল যেন ভূতনাথের গলায়-দড়ি-দেওয়া ঝোলানো চেহারাটা সে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পেয়ে নিজেকে প্রাণপণে সামলাচ্ছে। গলায় লালা জমে যাবার পর কাশতে লাগল।

শেষে নিজেকে সামলে মাথা নাড়তে নাড়তে বকুল বলল, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কেদার বোস ভুল শোনেনি তো?'

'না। এসব খবর কেউ ভুল শোনে না। কেদার তো নয়ই।'

বকুল ততক্ষনে মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। 'তুমি এতক্ষণ আমায় বলোনি কেন?'

গোপীজীবন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'বলব বলব করেও বলিনি। ভাবছিলাম, রাত্তিরে না বললাম, সারা রাত ছটফট করবে। কাল সকালে বলব। এরকম একটা দুঃসংবাদ।'

বকুল অস্থির হয়ে উঠেছিল। নিশ্বাস ফেলল বড় করে। গায়ের আঁচল সরিয়ে নিল। মুখ মুছল আঁচলে। বাতাস খেল। তার গাঁয়ের পাউডারের গন্ধ উঠছিল। অদ্ভুত শব্দ করল, যেন গলার কাছে কিছু আটকে গিয়েছে। ককাল আবার।

'পুরো খবর পাইনি। কাল পাব। খোঁজ করব,' গোপীজীবন বলল।

'রাজপুরাটা কোথায়? দু স্টেশন পর?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে তিনটে।'

'সেখানে ওর কে ছিল? গেল কেন? আর গলায় দড়িই বা কেমন করে দিল?'

'জানি না। কিছুই জানি না। খোঁজ করে বলতে হবে।'

'কবে ঘটেছে ব্যাপারটা? আজ?'

'না, আজ নয়। হয়ত কাল। ···কেদার সেসব কিছু বলল না। জানে না ভাল করে।'

বকুল বলল, 'এই তো দু তিনদিন আগেই এসেছিল। যেমন বকবক করে বকবক করল। তারপর কুয়ার কাছে গিয়ে চান করল ভর সন্ধেতে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইছিল। আমি গালমন্দ করলাম। চান করে উঠে রুটিমুটি খেল। তারপর চলি বকু-বউদি বলে চলে গেল। কই কিছু দেখিনি তো। যেমন থাকে তেমনই ছিল। হঠাৎ আত্মহত্যা করল! কেন?'

গোপীজীবন কোনো জবাব দিল না। সে জানে না।

বোধ হয় শেষ রাত। গোপীজীবন বুঝতেই পারেনি সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখছে, নাকি জেগে জেগেই শব্দটা শুনেছে। মনে হল ঘুমের মধ্যেই শুনছিল। গোপীজীবন যেন বলতে যাচ্ছিল, 'কী যে করছ! চুপ করো। চারপাশে লোকজন আছে। চুপ করো।' বলতে বলতে তার ঘুম পাতলা হয়ে, নাকি

ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হল, শব্দটা সে স্বপ্নের মধ্যে শুনছে না, জেগে জেগেই শুনতে পাচ্ছে।

চোখ খুলল গোপীজীবন। ঘরের মধ্যে ঢুকেছে? ফরসা হয়ে আসছে? তারপরই খেয়াল হল বকুল কাঁদছে।

পাশ ফিরল গোপীজীবন। দেখল বকুলকে।

বকুল কুঁকড়ে হাত পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। মাথা গড়িয়ে বালিশের তলায় নেমে এসেছে। একটা হাত গলার কাছে, অন্যটা বালিশের ওপর। বালিশের কোণা মুঠো করে ধরে আছে বকুল। তার চোখমুখ কোঁচকানো, ঠোঁট ফুলে আছে। ঘুমের মধ্যে বকুল কেঁদে উঠেছে।

গোপীজীবন বকুলের গায়ে হাত দিয়ে নাড়তে যাচ্ছিল। এই— কী হল। এই, কাঁদছ কেন?

হাত বাড়াতে গিয়েও গোপীজীবন হাত বাড়াল না। ঘুমের মধ্যে এই কান্না আর কতক্ষণ কাঁদতে পারবে বকুল। তার কান্না থেমে যাবে।

বকুল কি ভূতনাথের স্বপ্ন দেখছে?

মনে হয়, ওই ছেলেটারই স্বপ্ন দেখছে বকুল। ভূতনাথের গলায়-দড়ি দেওয়া চেহারাটাই দেখছে। নাকি ভূতনাথকেই দেখছে— 'অন্যভাবে—। মৃত বা জীবিত কী চেহারায় ভূতনাথকে দেখছে বকুল কেমন করে জানবে গোপীজীবন। অন্যের দেখা স্বপ্ন—সে দুঃস্বপ্ন সুখস্বপ্ন যেমনই হোক, গোপীজীবনের পক্ষে জেনে ফেলা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, দুঃস্বপ্ন না দেখলে কেউ কাঁদে না।

গোপীজীবন সামান্য অপেক্ষা করল।

বকুল কাঁদতে কাঁদতে কী বলল। তারপর চুপ করে গেল। ওর মুখের কোঁচকানো ভাবটা মিলিয়ে এল ধীরে ধীরে। বাচ্চারা যেমন ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে ঠোঁট ফুলিয়ে—এও অনেকটা সেইরকম। এই কাঁদল, তারপর সবই মিলিয়ে গেল।

গোপীজীবন স্ত্রীর মুখের ঘুমন্ত চেহারাটা দেখল কিছুক্ষণ। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তার কত কিছু আড়াল পড়ে যায়। এই যে এখন বকুলকে যেমন দেখাচ্ছে, তার ঠোঁট, মুখ, গাল, চোখ— এর কোনোটাই সাধারণভাবে সারাদিন তার মধ্যে দেখা যাবে না। এখন যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বকুলের মধ্যে রাগ নেই, অভিমান নেই, কর্কশতা নেই—সে বেশ শান্ত নরম শিষ্ট ধরনের স্ত্রীলোক। কিন্তু অন্য সময় বকুলকে উলটোই মনে হবে।

গোপীজীবন আরও একটু মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীকে দেখতে লাগল। বকুলের মুখের গড়ন ছোট এবং গোল। কিন্তু ভারি। তার গাল ভারি, থুতনি মোটা, নাক মোটা, চোখ দুটি বড়, ভেসে-ওঠা, কপাল ছোট। মাথার চুল কালো নয়, রুক্ষ লালচে মতন।

বকুলকে রূপসী বা সুন্দরী বলা যাবে না। এমনকি তাকে সুশ্রীও বলা যাবে না আবার একেবারে অবজ্ঞার সঙ্গে উড়িয়েও দেওয়া যাবে না বকুলকে। তার চেহারার মধ্যে তাত আছে, গড়নের মধ্যেও এমন একটা টান আছে যে বকুলকে অবহেলা করা মুশকিল।

গোপীজীবনও যখন প্রথমে বকুলকে দেখেছিল—তার খারাপ লাগেনি। বরং সে আকর্ষণ বোধ করছিল। বকুলও তখন অন্য-রকম ছিল। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল। খানিকটা হালকা। নিজেকে সে চেপে রাখতেও পারত। বা পেরেছিল। সাধারণত বকুলের মতন মেয়ের পক্ষে যা হওয়া সম্ভব ছিল না।

বকুলের জীবনের একটা দিক তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। অবশ্য এই অপরিচ্ছন্নতার জন্যে তাকে দায়ী করা যায় না। বকুলের বাবা সুরঞ্জন সরকার চামড়া চালানোর ব্যবসা করতেন। তাঁর ট্যানারি ছিল জঙ্গলের কাছে। ব্যবসা বড় নয়, আবার ছোটও নয় খুব। দু পাঁচজন বাঁধা খদ্দের ছিল—তাদের সঙ্গেই কারবার। মানুষটির আবার শিকারের নেশা ছিল। একবার শিকারে গিয়ে তিনি

দুর্ঘটনায় পড়েন। তাঁর জিপগাড়ি ওপর থেকে ফুট পঞ্চাশ নিচে মহুয়া বনের জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। সুরঞ্জন সরকারকে কারাই বা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা কাছাকাছি যে হাসপাতালে সুরঞ্জন ছিলেন সেখানে এক আয়ার সঙ্গে তাঁর ভাবসাব হয়ে যায়। ওসব দিকের হাসপাতালে নার্স আর আয়ার মধ্যে পার্থক্য বড় বোঝা যায় না। হাত পা পিঠের চোট সারিয়ে সুরঞ্জন যখন তাঁর জঙ্গল বাড়িতে এলেন আয়াটিকে নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে।

শহরে ছিলেন সুরঞ্জনের স্ত্রী। জঙ্গল বাড়িতে সেই আয়া মেয়েটি। বকুল হল আয়ার গর্ভজাত কন্যা। সুরঞ্জনের স্ত্রী মারা যাবার পর জঙ্গলবাড়ি থেকে বকুলরা শহরের বাড়িতে চলে আসে। প্রথম স্ত্রীর কোনো জীবিত সন্তান ছিল না। ওঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন না, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য মহিলার যে, তিন চারটি সন্তানের মধ্যে কেউই বছর দুয়েকের বেশি বাঁচেনি। ফলে শেষের দিকে ওঁরা আর সন্তানের আশা করতেন না।

বকুলের মাকে সুরঞ্জন আইন মতে বিয়ে করলেও সামাজিকভাবে তাঁরা স্বীকৃতি পাননি। বা বলা ভাল, স্বাভাবিকভাবে ও সহজ সম্পর্কে সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি। বোধহয় অনাদরই করে গেছে বরাবর। কিছুটা অবহেলা দেখিয়েছে। বকুলের মা এই ক্ষোভ আর জ্বালা নিয়ে একসময় মারাও গেলেন। সুরঞ্জন ততদিনে ট্যানারি প্রায় তুলেই দিয়েছিলেন। শারীরিক ক্লেশ তাঁকে ক্রমেই অথর্ব করে তুলছিল। মোটামুটি টাকাপয়সা, কিছু জমিজমা— এইসব সংগতি তাঁকে তেমন নিরুদ্বিগ্ন করতে পারছিল না। বকুলের বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশে গিয়ে দাঁড়াল। সুরঞ্জন আবার অসুস্থ হলেন। অধৈর্যও হয়ে পড়ছিলেন। দুশ্চিন্তা তাঁকে অসহায় করে তুলছিল। বকুল আঠাশ হয়ে গেল। সুরঞ্জন বকুলের জন্যে ভাল কোনো ছেলে যোগাড় করতে পারছিলেন না। শেষমেষ গোপীজীবনকেই তাঁর পছন্দ হল।

গোপীজীবন তখন দু-তিনঘাটের জল খেয়ে বড়াকি সরাইয়ে গিয়ে বসেছে। তার বয়েস হতে গিয়েছিল চল্লিশের কাছাকাছি। হাত বাড়ালেই ধরা যায় চল্লিশকে। সুরঞ্জন কথাটা বলামাত্র গোপীজীবন রাজি হয়ে গেল। তারও তো লোভ ছিল বকুলের ওপর।

বিয়ের পর গোপীজীবন শ্বশুরকে বোঝাল এই জায়গাটায় তার পশার হবার সুযোগ নেই। সে কাছাকাছি একটা ছোট শহরে গিয়ে বসতে চায়।

সুরঞ্জন আপত্তি করলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, একবার যেখানে মাছি উড়তে শুরু করে সেখানে নোংরা থাক না থাক—মাছির দল আসবেই।

গোপীজীবন এই শহরে আছে আজ পাঁচ বছরেরও বেশি। বকুলের বাবা মারা গেছেন বছর তিন হতে চলল। শেষের দিকে তিনি মেয়ের কাছেও ছিলেন প্রায় মাস দশেক। গোপীজীবনের পেশাদারি ব্যর্থতায় তিনিও খুশি হননি; তবে বকুল যতটা বীতস্পৃহ, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ—এতটা সুরঞ্জন ছিলেন না।

গোপীজীবন যখন এই শহরে আসে তখন তার মনে হয়েছিল, সে এমন একটা জায়গা বেছে নেবে যেখানে তার পেশার সুবিধে হয়। একেবারে সদরে, বাজারে সে বসবে না। সেখানে পুরনোরা আছে। স্যান্ডেলের ডিসপেনসারি ছাড়াও বুড়ো ঘোষ, বাগীশ্বর মিশ্র—এরা ছিল সদরে। গোপীজীবন খানিকটা তফাতে, একটু গরিব-গুর্বো এলাকায় বসতে চেয়েছিল। বড় জায়গায় বসার অনেক ঝঞ্ঝাট। আর ডাক্তারখানা তো চোখ বাঁধানো শাড়ি গয়নার দোকান নয় যে—সদরে বসতে হবে। ঘিঞ্জি, গরিব এলাকায় বসার সুবিধে হল, হাতের কাছে কম পয়সার ডাক্তার পেলে ওরা তার কাছেই আসবে। মানুষ চায় সুবিধে আর সুলভ চিকিৎসা। যাও না স্যান্ডেলের কাছে, গায়ে একশো চার জ্বর নিয়ে কম্বলে মাথা মুড়ে

তার দাবাই খানায় গিয়ে দু'ঘন্টা বসে থাকতে হবে। ডিস্পেন-সারিতে দশ টাকা প্রণামী, অবশ্য ওষুধপত্র তার দোকান থেকেই নিতে হবে। স্যান্ডেলের বাড়িতে গিয়ে দেখাতে চাও যোলো টাকা। সকালে মাত্র দু'ঘণ্টা রোগী দেখে বাড়িতে। লোকের ধারণা বাড়িতে ডাক্তারবাবু একটু ভাল করে দেখে, ডিসপেনসারিতে পাইকিরি হারে।

বকুল প্রথমে এতটা বোঝেনি। সামান্য আপত্তি করলেও চুপ করে গিয়েছিল।

এমন সময় এল ভূতনাথ।

হরিবাবুর হোটেলে ভাত খেতে গিয়ে আলাপ। গোপীজীবন তখন হপ্তায় দু-একদিন করে আসে এখানে—আর ডিসপেনসারির জায়গা খুঁজে বেড়ায়।

ভূতনাথ একেবারে ছোকরা। বছর বাইশ চব্বিশ বয়েস।

হরিবাবুর দোকানে সে ডাল আর কুমড়োর তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছিল গোগ্রাসে। খানিকটা টক দই দিয়েছিল পাতে।

ভূতনাথের সঙ্গে আলাপ হতেই সে বলল, 'আমি আপনাকে ঘর খুঁজে দেব স্যার।'

গোপীজীবন ভেবেছিল, ভূতনাথ বুঝি পয়সাকড়ি নেবে।

ভূতনাথ বলল, 'টাকা! ···না স্যার, টাকাফাকা আমি নেব না। আমি আপনাকে বাড়ি খুঁজে দেব। আপনার সঙ্গে আমি যেদিন ঘুরবো, আমাকে এক থালা ভাত খাইয়ে দেবেন। পারলে উইথ ফিশ। এরা মাছের বড় দাম নেয়। আমি কোথা থেকে অত পয়সা পাব!'

অবাক ছেলে। সেই ভূতনাথই খুঁজে খুঁজে পিপালি মহললায় ওই ঘরটায় এনে বসিয়ে দিল গোপীজীবনকে। গোপী-জীবনেরও প্রথমটায় তেমন পছন্দ হয়নি জায়গাটা। ধানসার মহললার সামনের দিকে হলেও একরকম ছিল। এ একেবারে

পিপলি গলিতে। পিপলি গলির দুর্নাম এবং খ্যাতি যেসব কারণে তার কিছু প্রমাণ তো গলির মুখে ঢুকলেই বোঝা যায়।

গোপীজীবন খুঁতখুঁত করেছিল। 'জায়গাটা ভাল নয় ভূতনাথ।'

ভূতনাথ হাসতে লাগল। মাথায় বড় বড় চুল। ঘাড় ছাড়িয়ে যাবে যেন। কানে কপালে চুল লুটোচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় চার ছ'মাস অন্তর মাথা পরিষ্কার করে। তার বড় বড় চোখ, মোটা ঠোঁট, থুতনি, গায়ের রং তামাটে। পরনে পাজামা আর গায়ে কামিজ। গলার স্বর মোটা।

হাসতে হাসতে ভূতনাথ বলল, 'পঞ্চাশ টাকায় এত বড় ঘর দাদা। আপনি একপাশে বসবেন, অন্যপাশে কম্পাউণ্ডার। এত কম টাকায়—।

'কিন্তু ঘর তো পাকা নয়, মাথার ওপর খাপরার ছাদ?'

'পাকা ছাদের বাড়ি পেতে হলে তিনশো থেকে পাঁচশো ভাড়া। তার সঙ্গে পাঁচ সাত হাজার পান খরচা। ...খাপরার ছাদে ক্ষতি কিসের। এই শহরে বারো আনা মানুষই থাকে খাপরার তলায়। আপনি তো গরিব এলাকাই খুঁজছিলেন...'

'তা ইয়ে, মানে গলিটার মধ্যে যে খারাপ বস্তিটা আছে...ওই সব মেয়েটেয়ে, বুঝতে পারছ—'

ভূতনাথ বলল, 'ওরা আপনাকে খেতে আসছে। কী যে আপনি বলেন, দাদা। ওরা ওরা, আপনি আপনি। ডাক্তারের কাছে রোগী রোগী, কে কী তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এখানে দু-চারশো গজের মধ্যে কোনো ডাক্তারবাবু নেই। আপনি বসে যান।'

গোপীজীবন বসেই গেল শেষ পর্যন্ত। বকুলকে বা শ্বশুরকে আর যাই বলুক খারাপ বস্তিটার কথা বলেনি গোড়ায়। পিপলি গলির সবটাই তো ওই মেয়েদের দখলে নয়। ওখানে আরও কত মানুষ থাকে, টাঙাঅলা সবজিঅলা মুটে মজুর চাইকি কিছু টোপাও।

ভূতনাথ বলত, 'জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ঠিক না দাদা? গড্ ইজ্ এভরি হোয়ার—' বলে হো হো করে হাসত, তারপর নিজের পেট দেখিয়ে বলত, 'এই পেটের মধ্যেও গড দাউদাউ করে জ্বলছে।

ছেলেটা আত্মহত্যা করল। বকুলও আজ কেঁদে মরছে ছেলেটার জন্যে।

তিন

সকালে কেদার বোস এসেছিল ডাকতে।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছু কথাবার্তার পর গোপীজীবন বলল, 'তুমি শচীলালদের কাছে যাও আমি আসছি।'

গোপীজীবন দেরি করল না, তৈরি হয়ে নিতে লাগল।

বকুল খানিকটা বেলাতেই স্নান করে। তার কোনো তাড়াহুড়ো থাকে না। দুটি মাত্র মানুষ তারা, আর সবসময়ের একটা কাজের মেয়ে বাতাসী। ঝি আছে এক, ঠিকে কাজ করে; আর দরকারে পাওয়া যায় ছোটুকে। মন্থর, অলস ছন্দেই সকালটা কাটিয়ে দেয় বকুল। কিছু সংসার ঘরকর্মের কাজ, খানিকটা বাগান আর ফুলের টব নিয়ে সময় কাটানো, কখনো বা নিরিবিলি চুপচাপ বসে থাকা—এইভাবে সকাল ফুরিয়ে বেলা করে স্নানে যাওয়া তার অভ্যেস। মাথার চুল ছাড়াতেই কত সময় কেটে যায়। বকুলের চুল খুব কোঁকড়ানো। চিরুনির দাঁত আটকে যায়। চুল ছাড়িয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল তো আর বেরুতে চায় না। অকারণ স্নানের ঘরের এটা ওটা পরিষ্কার করে, গোছায়। তারপর স্নান। সে এক পর্ব। তবে মাঝে মাঝে সকালের দিকেও তার স্নান হয়ে যায়।

স্নান করে এসে বকুল দেখল গোপীজীবন বাইরে যাবার জন্যে তৈরি।

'কোথায় যাচ্ছ?' অবাক হয়ে বকুল বলল।

'কেদার ডাকতে এসেছিল। ...একবার যেতে হবে।'

'কোথায়?' বকুল ভুরু কুঁচকে বলল। সে সন্দেহ করেছিল।

গোপীজীবন বলল, 'ওই—দেখি কোথায় যেতে হয়। শুনছি রাজপুরাতেই ভূতনাথের বডি পাওয়া যাবে। ওরা কী এক ব্যবস্থা করেছে। থানাটানার হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলেছে।'

বকুল বুঝতে পারল। ভূতনাথের সৎকার করতে চলেছে গোপীজীবনরা। কোনো কথা বলল না সে। তার সেই রুক্ষতা, অসহিষ্ণু ভাব এখন আর নেই। বরং স্নানের পরও মুখটি মলিন দেখাচ্ছিল।

'তুমি এত তাড়াতাড়ি চান করে নিলে?'

'করে নিলাম। ...মাথা ধরে আছে। রাত্তিরে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হয়েছে, শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'একটু শুয়ে থাকো। আমি চলি।'

গোপীজীবন চলে যাচ্ছিল, বকুল পিছু ডাকল হঠাৎ, 'টাকা-পয়সা নিয়েছ?'

তাকাল গোপীজীবন। দেখল স্ত্রীকে। বলল, 'নিয়েছি।' সে আর দাঁড়াল না, ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বকুল দাঁড়িয়ে থাকল। অন্যমনস্ক। জানালার বাইরে করবী ঝোপ। তার ওপারে ফাঁকা জমি। রোদ এখনই কেমন ঝলসে উঠছে। স্নান করে আসার পর মাথা ঠাণ্ডা, কপাল গাল গলাও ঠাণ্ডা লাগছিল। মাথায় চুল ভিজে, এখনও চুলের ডগা দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে শাড়িতে।

বকুলের মনে হচ্ছিল সে শুয়ে পড়ে। দুর্বল লাগছিল। কপাল আর ভুরুর তলা দিয়ে ঘুম যেন নেশার মতন চোখে নেমে

আসছিল। শাড়িটাড়ি অগোছালো হয়ে রয়েছে—নয়ত সে শুয়ে পড়ত বিছানায়।

কিছুই নয়, তবু বকুলের মনে হল—জানলার বাইরে করবী ঝোপের পাশে রোদের মধ্যে যেন ভূতনাথের একটা আবছা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। চোখে দেখা যায় না, অথচ সে আছে। বকু-বউদিকে দেখছে।

গায়ের শাড়ি, আলগা তোয়ালে, পরনে সায়া—কিছুই ঠিক করল না বকুল। পা পা করে জানলার কাছে এগিয়ে গেল।

আর ঠিক তখনই এক ঝাঁক চড়ুই যেন একটা ঘূর্ণির মতন করবীগাছের গায়ে মাথার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিচমিচ করতে করতে। তারপর চোখের পলকে উড়ে গেল।

দুপুর গেল। বিকেল কাটাল। গোপীজীবন ফিরল না।

ফিরল সেই সন্ধে নাগাদ। ধুলোয় ময়লায় ঘামে শুকিয়ে যেন আধপোড়া সে। মাথার চুল রুক্ষ, লাল হয়ে উঠেছে। চোখ বসে গিয়েছে এক বেলাতেই।

বকুল কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, গোপীজীবন হাত তুলে থামতে বলল। জল চাইল খেতে।

প্রায় তিন গ্লাস জল খেয়ে বড় করে শ্বাস ফেলল গোপীজীবন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি কুয়োতলায় গিয়ে চান করে আসি। আমার গেঞ্জিটা লুঙ্গিটা বাতাসীকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। সাবানটাও দিতে বলো।'

অন্যদিন এসব কথা বলার দরকার করে না। সাহসও হয় না গোপীজীবনের। আজ সবাই অন্যরকম। গোপীজীবন চলে যেতে যেতে বলল, 'তোমার গানের মাস্টার আসেনি ?'

'এসেছিল। আজ না করে দিয়েছি।'

গোপীজীবন চলে গেল। কুয়াতলায় গিয়ে স্নান করবে। কুয়ার জল এখন ঠাণ্ডা। আরাম পাবে অনেক।

আলো তেমন জোর নয়। পাখাটাও চালিয়ে দিয়েছিল গোপীজীবন। ধীরে ধীরে চলছিল। চা খাচ্ছিল সে।

বকুল কাছেই বসে আছে। সে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। 'কী দেখলে?'

গোপীজীবন কিছুক্ষণ কথা বলল না। পরে বলল, 'সে শুনে আর কী করবে। গলায় দড়ি দিয়ে যে আত্মহত্যা করে তাকে কি আর ভাল দেখায়?'

বর্ণনা শোনার কৌতূহল বকুলের ছিল না। সে শুনতে চায় না—ভূতনাথকে কেমন দেখাচ্ছিল। সে জানতে চাইছে—গোপীজীবনরা ওখানে যাবার পর কী কী হল।

'কোথায় রেখেছিল ওকে?'

'থানার কাছে একটা মুন্দা ঘরে।'

'মারা গিয়েছে কবে?'

'আগের দিন। মানে, পরশু রাত্তিরে কোনো সময়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল। কাল সকালে জানা গিয়েছে।'

'পচে গিয়েছিল?'

'গন্ধ উঠছিল ভীষণ। ···থানার লোকগুলো ভালো। নয়ত অনেক ঝঞ্ঝাট হত। অবশ্য থানারও ঝঞ্ঝাট হত কম নয়। সদরে লাশ পাঠাতে হত। অত কিছু হয়নি। রেলের বাবুরা বলে কয়ে, আর শ'খানেক টাকা খরচ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছিল।'

বকুল আজ উস্কোখুস্কো উড়ো-সুড়ো হয়ে রয়েছে। সাজে পরিপাটি নেই। মাথার চুল এলো। গলার স্বরও ভাঙা ভাঙা।

'কোথায় নিয়ে গিয়ে পোড়ালে?' বকুল বলল।

'চাঁচরিঘাট বলে একটা জায়গায়। রেল কোয়ার্টার থেকে মাইল খানেক হবে। ওরা নদী বলে। নদী নয়—খাল মতন। গাছপালা ছিল। সেখানেই পোড়ানো হল।'

বকুল চা খাচ্ছিল না। পড়ে পড়ে জল হচ্ছে।

গোপীজীবন চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

চুপচাপ। হঠাৎ বকুল বলল, 'মুখাগ্নি কে করল?'

'আমি।'

'তুমি?'

'কেদার করতে চাইছিল না। ওর-কী বলে—গুরুদশা চলছে, মা মারা গিয়েছে সাত আটমাস আগে। শচীলাল বেহারি বামুন। তার নানা ছুঁত আছে। কবুতরী মেয়ে. তাছাড়া ওই জাতটাত নিয়ে কেদারদের…'

বকুল অবাক। কবুতরী মেয়েটাও গিয়েছিল শ্মশানে। ওই নোংরা কুচ্ছিত বেজাত বেজন্মা মেয়েটা যায় কেমন করে। কেন যায়? কে তাকে নিয়ে গিয়েছিল?

বিরক্ত হয়ে বকুল বলল, 'ওই মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে গেল?'

'আমরা যাবার আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল।'

'কেমন করে?'

'কেমন করে আবার। ট্রেনে।'

বকুল যেন বুঝতে পারছিল না কথাগুলো। সব কেমন জট পাকিয়ে রয়েছে। ভূতনাথ মরল রাজপুরায় রেল কোয়ার্টারে, আর কবুতরীর মতন একটা মেয়ে ছুটল ভূতনাথের সৎকার করা দেখতে। কেন?

বকুল বলল, 'ওই মেয়েটার হঠাৎ এমন প্রাণ কেঁদে উঠল? একটা বুড়ি মাগী, তাও বদবজ্জাত, নোংরা—ও গেল ভূতনাথকে পোড়াতে। ব্যাপারটা কী? তোমরা ওকে…' কথা শেষ করতে পারল না বকুল।

গোপীজীবন জানত, সত্যি কথাটা বলতে গেলে এইরকমই হবে। আবার মিথ্যে বলেও লাভ নেই। কোন দিন কেদার এসে হাজির হবে বাড়িতে - আর বকুল সবই জেনে যাবে। স্ত্রীকে রাগাতে চাইছিল না সে। বকুলকে এখন সামলে রাখতে না পারলে ভীষণ অশান্তি হবে।

গোপীজীবন বলল, 'ভূতনাথ মাঝে মাঝে কবুতরীর কাছে যেত—।'

'যেত…'

'আহা, তুমি বুঝতে পারছ না। …ভূতনাথ তো পিপলি গলিতেই থাকত একসময়। তাছাড়া ভূতনাথের মা যখন বেঁচে ছিলেন কবুতরী ওঁর কাছে কাজ করেছে।'

বকুল এত কিছু খুঁটিয়ে জানতে চায় না। জানার দরকার করেনি। তবে সে জানে ভূতনাথ একসময় পিপলি গলিতে এক কুঠিতে থাকত। ওর মা তখন বেঁচে নেই। মা যখন বেঁচে ছিলেন ওরা নয়াবাজারের দিকে থাকত। ভূতনাথ এত বেশি কথা বলত, এত রকমের কথা যে বকুল মন দিয়ে সব শুনতও না। তার মনেও থাকত না। তবে কবুতরীর কথা যদি বা কখনো সখনো উঠেছে—বকুল এমন করে ধমক দিত ভূতনাথকে যে সে আর ও-সব কথা তুলত না।

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল বকুলের। 'তা ও ওখানে গিয়ে কী করল?'

'কী আর! কান্নাকাটি।'

'মাগীর কত ঢং!'

গোপীজীবন কোনো জবাব দিল না। সিগারেট খেতে লাগল।

আজ বাইরে বাতাস রয়েছে বেশ। জ্যোৎস্নাও ফুটেছে ধবধবে। বাগানের গাছপালায় বাতাসের দমক লেগে শব্দ হচ্ছিল কখনো কখনো। অনেকটা তফাত থেকে ঝকমক শব্দ ভেসে আসছে। হোলির গান বসেছে কোথাও।

বকুল আচমকা বলল, 'ও আত্মহত্যা করল কেন? কিছু লিখে গেছে?'

'না।'

'কিছুই নয়?'

'না। ওই একটা টুকরো কাগজে হিজিবিজি···। লিখেছে, ও নিজেই আত্মহত্যা করছে।'

'কাগজ তোমরা দেখেছ ?'

'না। পুলিশ বলল। ···আমরা দেখে কী আর করব। লাশ আইডেন্টিফাই করতে হয়, করলাম। তারপর পোড়াবার কাজটা সেরে ফিরে এলাম। এখানকার ছোট দারোগা কেদারের খুব চেনাজানা। ছোট দারোগা চিঠি দিয়ে দিয়েছিল। তাতে ঝামেলা কম হল। ছোট দারোগা ভূতনাথকে ভালই চিনত। বলল, পাগলা ছোকরা। বেকার গলায় দড়ি দিল।'

বকুল মন দিয়েই শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'শহরের সবাই ওকে চিনত। শুধু যেন আমরাই চিনতাম না। লোকে এখন—' কথাটা আর শেষ করল না বকুল।

চুপচাপ। গোপীজীবন হাই তুলল। খুবই ক্লান্ত। সারাটা দিন কম ধকল তো গেল না। আজ তার ডিসপেনসারিও বন্ধ গেল। যুগল হয়ত ঝাঁপ তুলেছিল ডিসপেনসারির, কিন্তু ডাক্তার-বাবু না-থাকায় রোগীরা ফিরে গেছে।

'তুমি চা খেলে না ?'

'না। ভাল লাগছে না।'

গোপীজীবন যেন সান্ত্বনা দেবার মতন করে বলল, 'কী আর করবে! তোমার আমার তো হাত নেই। ওর মাথায় পোকা ছিল ঠিকই, তবে এভাবে নিজের জীবনটা শেষ করবে কে জানত।' বলে সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে রাখল। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ওদের বংশের নাকি এটা রোগ। কেদার বলছিল—ওর বাবাও আত্মহত্যা করেছিলেন—। মায়ের ব্যাপারটাও— !'

বকুল মাথা নাড়ল। 'কেদার সব জানে।'

'আমি তো জানতাম—মায়ের ফুড পয়জেন হয়েছিল।'

'তা ও মরতে বাইরে গেল কেন? এখান থেকে পালিয়ে কোন

এক রেল কোয়ার্টারে গিয়ে গলায় দড়ি দিল। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।'

গোপীজীবনরা খোঁজ খবর করে খানিকটা জেনেছে। রাজপুরার রেল কোয়ার্টারে ভূতনাথের পরিচিত এক পরিবার কিছুদিন ছিল। নিজের কেউ নয়। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ও নয়। তবে টেনেটুনে আত্মীয়তা পাতানো যেত। সেই ভদ্দরলোক তখন ছিলেন না! তাঁর বদলির হুকুম আসায় তিনি মাত্র দু'দিন আগে কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেছেন সপরিবারে। ফাঁকাই পড়েছিল কোয়ার্টার। কেমন করে সেই কোয়ার্টারে ভূতনাথ ঢুকল কে জানে! বকুলকে কথাটা বলল গোপীজীবন। 'রেলের বাবুরা বলছে, ও পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছিল। কোয়ার্টারের ভেতর দিকের ঘর খোলাই ছিল। দরজা ভেজানো ছিল মাত্র। ঘরে ঢুকে ঝুলে পড়েছে। আবার যে ঘরে ঢুকে গলায় দড়ি দিয়েছিল–সেই ঘরের জানলা খুলে রেখেছিল। যাতে লোকে দেখতে পায়। অদ্ভুত ছেলে!'

বকুল কোনো কথা বলল না।

ভূতনাথকে সেও তো কম দিন দেখল না। তাকে যে একেবারে চেনেওনি—তাও নয়। ছেলেটা পুরোপুরি পাগল ছিল বলে বকুল মনে করে না। ওর মাথায় পোকা ছিল হয়ত—থাকতেই পারে. কারই বা থাকে না। তবে যে-মানুষ খানিকটা খেয়ালি, বাউন্ডুলে, যার স্বভাব খানিকটা অদ্ভুত, বোধবুদ্ধি কম, হয়ত লজ্জাশরম নিয়ে মাথা ঘামায় না, কুণ্ঠাও নেই—সে অন্য যাই হোক পাগল হবে কেন?

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বকুল বলল, 'তোমার কাছে কবে গিয়েছিল শেষ।'

গোপীজীবন অন্যমনস্কভাবে বলল, 'এই তো দিন চার পাঁচ আগে।'

'কেমন দেখেছিলে ওকে ?'

'যেমন দেখি! গেল সন্ধের পর। যুগলকে দিয়ে নোংরা ঘুঘনি আর ডালবড়া আনাল। এক রাশ পেঁয়াজ। গব গব করে খেল। বলল, ও নাকি কাদের সঙ্গে হরিদ্বার বেড়াতে যাবে। ফিরতে ফিরতে মাসখানেক।' গোপীজীবন কথা বলতে বলতে তুলল আবার। ক্লান্ত লাগছিল। ঘুম পাচ্ছে। কী যেন মনে পড়ে যাওয়ায় আবার বলল, কোথ্‌ থেকে একটা ক্যালেন্ডারের ছবি কেটে নিয়ে গিয়েছিল। হরিদ্বারের গঙ্গার। সেটা দেওয়ালে এঁটে দিল। কে জানত ক'দিনু পরে ও এই রকম কাণ্ড করবে।' গোপীজীবনের গলায় কেমন বিরক্তিই ফুটে উঠল। রাগ। ওর গলা শুনলে মনে হবে, ভূতনাথ যেন তাকে ঠকিয়ে গেছে বলে ও ক্রুদ্ধ।

বকুল নিশ্বাস ফেলল। চুল সরাল কপাল থেকে। তারপর বলল, হরিদ্বার যাবার কথা আমাকেও বলেছিল ক'বার। বলেছিল এখানকার একটা দল যাবে—স্কুলের ক'জন মাস্টারনি, কোন্‌ মুদিঅলার বিধবা দিদি, সাইকেলের দোকানের মালিকের মা···। 'তা সে তো দেরি ছিল।'

'কবে এসেছিল এখানে ?'

'এই তো সেদিন। বৃহস্পতিবার। না না বুধবার। ···বিকেলের পর এল। এসে খানিকক্ষণ বাগানের মাটি কোপাল, চেঁচালো খানিকটা, তারপর বলল—তোমার একটা ছেঁড়া শাড়ি আর তেল সাবান দাও; চান করব। আমি গালমন্দ করলাম। যখনই চান করতে যাবে একটা করে শাড়ি দিতে হবে তাকে। পাটকরে পরবে। পরে কুয়াতলায় চান করতে যাবে। চান করে ফেলে রেখে চলে যাবে বাবু। চানের কাপড়, তেল···। সন্ধ্যেবেলায় কেউ তেল মাখে মাথায় ? ···তা চান করল অনেকক্ষণ ধরে। খেতে চাইল। ···আমি— আমি—' বকুল কেমন থেমে গেল, আমতা আমতা করল।

তারপর নিজেই যেন কেমন ধাঁধা খেয়ে গিয়েছে, নিচু গলায় বলল, 'আমার তখন গানের মাস্টার এসেছে। আর ও যখনই আসে এমন খাই খাই করে। খাওয়াও তো ভদ্দরলোকের মতন নয়। সব সময় বাড়িতে অত ব্যবস্থা থাকে? আমি রাগ করে দুটো কথা বলেছিলাম। পেটে যাদের চিতা জ্বলছে সর্বক্ষণ তাদের ভিখিরিগিরি মানায় না। যাও না, হাত-পা আছে, খাটো খোটো, রোজগার করো—পেটের জ্বালা নেভাও। ...তা ও কিছু বলল না। হাসল। নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে বাতাসীকে বলে বাসী রুটি নিল, গুড় নিল। খেল। জল খেল এক ঘটি। তারপর—চলি বকু বউদি বউদি বলে চলে গেল। ...গেল তো গেলই।'

॥ চার ॥

রোগী দেখার পাট চুকে গিয়েছিল। গোপীজীবনের হাত এখন খালি।

যুগল কম্পাউণ্ডার রোগীদের ওষুধ-বিষুধ দেওয়াও শেষ করেছে। করে তার সরু লম্বা খাতায় হিসেব লিখছিল।

গোপীজীবন ডাকল যুগলকে।

যুগল এ পাশে এল। যুগলকে যতটা ছোকরা মনে হয়—ততটা ছোকরা নয়। রোগা, বেঁটে চেহারা। কটা ধরনের চোখ। বুদ্ধিমান। সে জানে, পিপলি গলির লোকরা পয়সা দিতে গড়িমসি করে, দুটাকার বদলে পঞ্চাশটা পয়সা ঠেকিয়ে পালাতে পারলেই বেঁচে যায়। যুগলও সমান চালাক। ওষুধ দেবার আগে সে পুরো দামটাই আদায় করে নেয়। না নিলে ডাক্তারবাবুর চলবে কেমন করে? ডাক্তারবাবুর না চললে তারও তো চলবে না। সে পাস করা কম্পাউণ্ডার। আগে ঘোষ ডাক্তারের কাছে কাজ করত। লোকটা

ভাল নয়। মাইনে দিতে ভোগ্যত। স্যাম্পল ওষুধ বেচত। সস্তা ওষুধের দাম নিত দুগুণ। পাছে ধরা পড়ে যায়, ট্যাবলেট গুঁড়ো করে পুরিয়া করতে বলত। তাই বেচত রোগীকে। গোপীবাবু এসব করে না। করে না বলেই তার সারাদিনের রোজগার কম।

'ডাকছেন?' যুগল বলল।

'তুমি সকালে মহেশবাবুর বাড়িতে ওষুধ পেঁছে দিয়েছ?'

'দিয়েছি।'

'বললেন কিছু?'

'বলতেন। আমি বললাম, আপনি শহরে নেই। ভূতনাথের খবর পেয়ে রাজপুরায় গিয়েছিলেন কাল। বাড়ি ফিরেছেন রাত্তিরে। কাল আর ওষুধ পাঠাতে পারেননি।'

'ভূতনাথের কথায় কী বললেন?'

'নাকমুখ সিটকে গালাগাল দিলেন।'

গোপীজীবন গম্ভীর হয়ে গেল। মহেশের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

'রোগীর কথা বললেন কিছু?'

'বললেন, কালও জ্বর বেড়েছিল। বার চারেক বমি করেছেন। আপনাকে যেতে বলেছেন।'

গোপীজীবন মুখে কিছু বলল না, মাথা নাড়ল। তারপর ইশারায় বুঝিয়ে দিল—যুগল এবার যেতে পারে।

যুগল সঙ্গে সঙ্গে গেল না। হিসেব শেষ করে, খাতাপত্তর আর টাকাপয়সা এনে গোপীজীবনের টেবিলে রাখল। 'আমি যাব?'

'যাও। তালা আমি বন্ধ করে দেব।'

দুজনের কাছেই চাবি থাকে। কাল সকালে যুগল এসে ডিসপেনসারি খুলবে।

যুগল চলে যাবার পর সব ফাঁকা। আর কোনো লোক নেই ডিসপেনসারিতে। গোপীজীবন চুপ করে বসে থাকল সামান্য

সময়। তারপর হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে জলের বোতল টেনে নিল। জল খেল সামান্য।

জল খেয়ে সিগারেট ধরাল। পিপলি গলিতে ফাগুয়ার হল্লা আজ আরও বেশি। কাল হোলি। এই হল্লা কানে সয়ে গেছে।

কবুতরীর গলা আর শোনা যাচ্ছে না। গোপীজীবন আজ সারাদিন তাকে দেখেও নি। না সকালে, না এই সন্ধেতে। মেয়েটা কি ভূতনাথের শোকে ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে? না, কোথাও গিয়েছে?

মানুষ বড় অদ্ভুত। গোপীজীবন জানে অনেক কিছুই শুনেছেও নানা কথা—, কিন্তু সে ভাবতে পারেনি—কবুতরী এই-ভাবে ভূতনাথের খবর পেয়ে রাজপুরায় ছুটে যাবে। যে-মেয়েটা আগের দিন রাত্রে ধেনো মদ খেয়ে পরনের কাপড় উড়িয়ে হোলির বেলালুলা গান গাইছিল—সেই মেয়েই পরের দিন সাত সকালে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়েছে ভূতনাথের মরা চেহারাটা দেখতে। আর কী তার অবস্থা তখন?

বকুলের বেলাতেও গোপীজীবন এমনটা আশা করেনি। পরশু রাত্রে বিছানায় শুয়ে বকুল যেভাবে শুরু করেছিল তাতে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ঝড় উঠল। বকুল যে কখন কী নিয়ে ঝড় উঠোবে কেউ জানে না। অনুমানও করা যায় না। সে হয়ত ভালই আছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুশি, ঝরঝরে ভাব তার, হঠাৎ কখন যে একটা জ্বলন্ত কাঠি কোথাও গিয়ে পড়ল—আর সে দপ্ করে জ্বলে উঠল। সেই বকুলও পরশু রাত থেকে চুপচাপ। তার আগুন যেন জ্বলার অবস্থায় নেই।

গোপীজীবন অন্যমনস্কভাবে বসে থাকল।

গলির নালা থেকে গন্ধ আসছিল। টিকিয়া লোকটাকে অনেক বলে-করেও হপ্তায় এক দিনের বেশি দুদিন নালা পরিষ্কার করাতে পারল না যুগল। আর এখন তো হোলি পরব, কে কার খোঁজ

রাখে। যুগলকে বলতে হবে কাল খানিকটা ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে।

হিসেবের খাতাটা খোলা ছিল। গোপীজীবন হিসেব দেখল না, খাতাটা মুড়ে সরিয়ে রাখল একপাশে। টাকাপয়সা পকেটে রেখে দিল।

টিকটিকি ডাকছে। গোপীজীবনের হঠাৎ মনে হল হল, ভূতনাথ বলত, দাদা টিকটিকি দিনে কম ডাকে, রাত্তিরে বেশি ডাকে কেন বলুন তো?

এই অদ্ভুত প্রশ্নের কোনো জবাব দিত না গোপীজীবন। সে খেয়াল করে কখনো শোনেওনি টিকটিকি দিনে না রাতে বেশি ডাকে। তবে হালে লক্ষ্য করছে—ঘড়ির ঘন্টা পড়ার মতন—রাত আটটা নাগাদ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে।

গোপীজীবন তাকিয়ে থাকল, রোগী-দেখা বেঞ্চিটা মড়ার মতন পড়ে আছে একপাশে। চাদরটা বড় ময়লা। বেঞ্চির তলায় একটা পুঁটলি। গোপীজীবনের জন্যে ভূতনাথ একটা পুরনো ওজন-যন্ত্র জুটিয়ে এনেছিল, রোগীদের ওজন দেখা হবে। যন্ত্রটা খারাপ। মেরামত করাও গেল না। এখন একপাশে পড়ে আছে।

বসে থাকতে থাকতে গোপীজীবন টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার ডায়েরি-খাতা বার করল।

তারপর একসময় লিখতে লাগল।

'আমার জীবনে আরও একটি আত্মহত্যা দেখিলাম। প্রথমটি দেখিয়াছিলাম অল্প বয়েসে। আমাদের পাড়ার এক মাসিমা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা ছিলেন। দেওরের আশ্রিতা ছিলেন। একদিন তিনি মাঝ-দুপুরে বাড়ির কাছে পুরানো ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ইঁদারায় বিন্দুমাত্র জল ছিল না। ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম তখন। অর্ধেক কুয়ায়ই শুখনা। মাসিমাদের বাড়ির ইঁদারাটি এমনিতেই পরিত্যক্ত; জল পাওয়া

যায় না। মাসিমাকে যখন উপরে তোলা হইল তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। ঘাড় ভাঙা, মাথা ফাটা, পা দোমড়ানো। রক্তাক্ত চেহারা। বীভৎস। মাসিমা কেন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন আমি জানি না। পাড়ার লোকে নানা কথা বলিত।

"আর এতকাল পরে ভূতনাথকে দেখিলাম। চোখে না দেখি কানে যে আত্মহত্যার খবর না আসিয়াছে এমন নয়। তাহাদের চিনি বা না চিনি—ঘটনার কথা শুনিয়াছি। মাসিমার আত্মহত্যার এতকাল পরে আবার এক আত্মঘাতীকে চোখে দেখিলাম। মানুষের চোখ অনেক কিছুই দেখিতে চাহে না। কিন্তু সংসার এমন যে, সে কখনো কখনো তাহার কুৎসিত রূপ দেখাইয়া লয়।

'ভূতনাথকে যেমন দেখিয়াছিলাম তাহা আমার লিখিতে ইচ্ছা নাই। কী লিখিব? আত্মহত্যা করিলে মানুষকে কি সুন্দর দেখায়? তাহাকে কেমন দেখিয়াছিলাম—তাহা লিখিয়া কী লাভ! সে কেন যে আত্মহত্যা করিল তাহাই আমি ভাবিতেছি। এমন কাজ সে কেন করিল? কেন?

'ভূতনাথকে আমি আজ কয়েক বছর হইতেই চিনি। সে আমার ডিসপেনসারির ঘর ঠিক করিয়া দিয়াছিল; আমরা লালাবাবুর যে মহললায় থাকি সেই বাড়িটির ব্যবস্থাও ভূতনাথের। মহললাটি মোটামুটি নিরিবিলি, গাছগাছালিও চোখে পড়ে, ডাঙা নিচু হইয়া শুখা নদীর চরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এই বাড়ির ভাড়াও বেশি নয়। ভূতনাথ না থাকিলে বাড়িটি আমাদের জুটিত না। বকুল এই কারণে প্রথম হইতেই ভূতনাথের উপর খানিকটা প্রসন্ন ছিল। আমার শ্বশুরমহাশয় যখন অসুস্থ এবং আমাদের কাছেই ছিলেন—তখনও ভূতনাথ নানা ব্যাপারে আমাদের সহায় হইয়াছে। শ্বশুরমহাশয় এখানেই মারা যান।

'ভূতনাথকে আমি যতটা দেখিয়াছি ও চিনিয়াছি তাহাতে কখনোই মনে হয় নাই সে আত্মহত্যা করিতে পারে! সে উন্মাদ

ছিল না, হঠকারি ছিল না, অসম্ভব রকমের ভাবপ্রবণও ছিল না। ভূতনাথকে আমি কখনো আত্মহত্যার কথা বলিতে শুনি নাই। হতাশায় বা গ্লানিতে সে যে মরিতে বসিয়াছিল তাহাও নয়। নির্জীব রুগ্ন তাহাকে দেখি নাই। তাহার কোনো অসুখ ছিল বলিয়াও আমি জানি না।

'তা হইলে ভূতনাথ কেন আত্মহত্যা করিল? কেন?

'এক একজন মানুষ থাকে যাহাদের সাংসারিক দাবি খুব কম। ভূতনাথ সেই গোত্রের মানুষ। ধানসার মহললার মধ্যেই সে থাকিত। তামাকপটির কাছে একটি কোঠায়। আগে সে পিপলি গলিতেও ছিল। অবশ্য তাহার মা যখন জীবিত ছিলেন ভূতনাথরা নয়াবাজারের দিকেই থাকিত। তাহার মাকে আমি দেখি নাই। বাবা আগেই সংসার ছাড়িয়াছেন।

'ভূতনাথ পাকাপাকিভাবে কিছুই করিত না। নিজের খেয়ালে-মরজিতে আজ একরকম কাল অন্যরকম 'কাজকর্ম' লইয়া মাতিয়া থাকিত। সে কী না করিয়াছে! রেলের মাল গুদামের মাল খালাসের ঠিকাদারির কাজ, স্টেশনের কাছে চায়ের স্টল, বাজারপাড়ায় কবিরাজী তেল আর পাচন বিক্রির দোকান, ঘিয়ের ব্যবসা, বাঙালি পাড়ায় আচার-অনুষ্ঠানে সামিয়ানা টাঙানো—এই রকম কত কী! কোনোটাতেই তাহার মন বসে নাই। ফলে পয়সাকড়ি যাহা রোজগার করিত তাহার জের বেশিদিন চলিত না। তখন সে নিঃস্ব।

'ভূতনাথকে দেখিলে মনে হইত আধ-পাগলা ছেলে। মাথায় লম্বা, গায়ে ছিপছিপে, মুখে কিছু দাড়ি, মাথায় এক ঝুড়ি রুক্ষ চুল। ওর সামনের দাঁত দুটি ছিল বড়, ঠোঁট মোটা, ওপর গালে একটি কাটার দাগ। ভূতনাথের চোখ দুটি সরল, কিন্তু ছোট ছোট, চোখের পাতা সামান্যই ফাঁক হইত, তাহার মধ্য দিয়া ভূতনাথের কালো কালো মণিদুটি ঝকঝক করিত।

'তাহার বেশভূষা সামান্য। কোনো দিন ময়লা প্যাণ্ট, একটা শার্ট বা কলার দেওয়া গেঞ্জি; কোনোদিন বা ধুতি আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। ধুতি সে মালকোঁচা দিয়া পরিত। একটি ভাঙাচোরা সাইকেল ছিল তাহার সঙ্গী।

'ভূতনাথ যে ব্যাধিতে ভুগিত, তাহা বুঝি ক্ষুধা। ব্যাধি না বলিয়া তাহাকে উহার ধাত বলা যায়। মুখে আমরা তাহাকে রোগ বলি বটে কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বকুল বলিত—'রাক্ষসের খিদে'। ঠাট্টা করিয়া বলিত বটে তবে...'

পায়ের শব্দে গোপীজীবন কলম থামিয়ে মুখ তুলল।

কবুতরী।

কবুতরী পার্টিশানের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল।

গোপীজীবন কিছু বলতে পারল না। আজ সকালে সে কবুতরীকে দেখেনি। গলিতে দাঁড়িয়ে সে বার কয়েক ওর কোঠার দিকে তাকিয়ে দেখেছে। দরজা বন্ধ। সামনের দুহাত রকের মতন জায়গায় একটা ভাঙা চারপাইয়া দড়ির বুনোনগুলো ছিঁড়ে ঝুলছে। কালো কুকুরটাই শুয়েছিল দরজার কাছে।

গোপীজীবন ডাকল হাত নেড়ে।

কবুতরী ভেতরে এল। তার পায়ে গায়ে বল নেই। অবসাদ আর দুর্বলতায় সে যেন টাল যাচ্ছিল। মরা শুকনো চেহারা।

গোপীজীবন বলল, 'কী রে। কেমন আছিস?'

কবুতরী কোনো জবাব দিল না।

গোপীজীবন ইশারা করে বসতে বলল। রোগী-দেখা বেঞ্চি ছাড়া একটা টিনের চেয়ার আছে সামনে।

কবুতরী রোগী-দেখা বেঞ্চিটাতেই বসল।

গোপীজীবন কবুতরীকেই দেখছিল। গোলগাল ফোলা চেহারা কবুতরীর: মুখটাও ফোলা। এখন সেই ফোলা মুখ শুকনো, রুক্ষ, কালো। বড় বড় দুটি চোখ কিন্তু কেমন বসে যাওয়া,

আচ্ছন্ন। কপালে কালসিটে, গালে একটা ক্ষত। মাথার চুল রুক্ষ জটপড়া। পরনে এক ময়লা ছেঁড়া শাড়ি, গায়ের জামাটাও ছেঁড়া।

কী যে বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না গোপীজীবন।

অনেক পরে বলল, 'তুই কি এখনই ঘর থেকে বেরুলি?'

কবুতরী কিছুক্ষণ পরে মাথা নাড়ল।

'কিছু খাসনি?'

মাথা নাড়ল কবুতরী। খায়নি।

'কাল থেকে ভুখা আছিস?'

'হ্যাঁ।'

'পানিও খাসনি?'

'খেয়েছি।' কবুতরী বাংলা বলতে পারে ভালই। কথায় টান থাকে হিন্দি জিবের। নয়ত তার বড় একটা আটকায় না কথা বলতে।

গোপীজীবন যেন কোনো অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল কী বলবে সে! একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। সময় নিল নিজেকে গোছাতে।

'কাল থেকে ঘর বন্ধ করে পড়ে আছিস? সারাদিন ঘুমোলি?'

কবুতরী কথার জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ কাঁদতে লাগল। এই কান্না জোর নয়, কালকের মতন ভয়ংকরও নয়। গলায় জড়ানো, ফোঁপানোর শব্দ মেশানো কান্না।

গোপীজীবন বলল, 'কেঁদে আর কী করবি! কেউ যদি নিজে ইচ্ছে করে মরে—তুই আমি কী করতে পারি! ওর কপালে—'

কবুতরী হঠাৎ বলল, 'দো দিন আগে আমার কাছে এসেছিল।'

গোপীজীবন জানে কখনো সখনো ভূতনাথ কবুতরীর কাছে আসত।

'কেন?'

'কুছ বলল না। খাটিয়ায় শো থাকল। পুছলাম—লাড্ডু

খাবি ? ব'দিয়ার লাড্ডু ছিল। দো লাড্ডু দিলাম। না খেলো। আমি বললাম, কী রে ভুতিয়া—তু লাড্ডু খাবি না? ব'দিয়ার লাড্ডু? তো বলল, না দিদি—, তু প্যানি দে, পান খিলা।' কবুতরী বলল আস্তে আস্তে; যেন সেদিনের কথাটা ভাবছে, মনে মনে দেখছে ভূতনাথকে, দেখছে আর বলছে।

কবুতরীর কাছ থেকে জল আর পান খেয়ে ভূতনাথ আরও খানিকক্ষণ শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে মজার কথাও বলল দু চারটে। বিড়ি খেল। তারপর দুটো টাকা নিল কবুতরীর কাছ থেকে, নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় নাকি বলেছিল হোলির দিন থাকবে না।

বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল কবুতরী।

গোপীজীবন বলল, আর কেঁদে কী করবি! চুপ যা।'

কবুতরী বলল, 'ভুতিয়াকো কুছ হয়েছিল ডাগ্‌তারবাবু!'

'কী হয়েছিল?'

'মালুম নেহি।'

কবুতরীকে আর বসিয়ে রাখতে চাইছিল না গোপীজীবন। ও যে খুবই দুর্বল অবসন্ন বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না গোপীজীবনের। হয়ত এখনও কোনো ঘোরের মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে মাথা-ঘাড় হেলে যাচ্ছিল।

গোপীজীবন বলল, 'তুই ঘর যা। কিছু খেয়ে নিস। ভুখা থাকিস না। একটা ওষুধ দিচ্ছি খেয়ে নিবি রাতে। ভুখা পেটে খাবি না। বোস—' বলে গোপীজীবন নিজেই ওষুধ আনতে উঠে গেল।

ডিসপেনসারির কাচের আলমারি খুলে গোপীজীবন ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'ভূতনাথের কোঠিতে একবার যেতে হবে। তার কোঠির দরজা বন্ধ। তালা লাগানো। চাবি কোথায় পাব? পকেটে ওর চাবি ছিল না। পুলিশ কোনো চাবি পায়নি।'

চাবির কথায় কবুতরীর যেন হঠাৎ কী খেয়াল হল। বলল,

'এক চাবি তো হামার কাছে পড়ে আছে। ভ্‌তিয়ার চাবি? খাটিয়ার পাশমে ছিল।'

গোপীজীবন দ্‌টো ট্যাবলেট নিয়ে ফিরে এল। দিল কব্‌তরীকে। বলল, 'নে। ভ্‌খা পেটে খাবি না। কিছ্‌ খেয়ে নিবি। তারপর একটা বড়ি খাবি। রাতে ভাল ঘ্‌ম হবে। সকালে ভাল লাগবে। ...যা!' বলেই চাবির কথা মনে পড়ল তার। 'চাবির কথা কী বললি? ভূতনাথের চাবি? ...তোর বাড়িতে?'

কব্‌তরী উঠে দাঁড়াল। বলল হঠাৎ, 'চাবি হামার বাড়িতে ফেলল তো ভ্‌তিয়া ওর কোঠিতে না গেল?' সন্দেহটা স্পষ্ট! চাবি যদি কব্‌তরীর বাড়িতেই ফেলে রেখে যাবে—তাহলে কি ভূতনাথ সেদিন আর তার বাড়িতে ফেরেনি? ছিল কোথায়? ও কি সেইদিনই এই শহর ছেড়ে চলে গেছে!

গোপীজীবন বলল, 'খোঁজ করে দেখতে হবে। এমনও তো হতে পারে চাবিটা অন্য কারো?

কব্‌তরী মাথা নাড়ল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'দোসরা কেউ হামার কোঠিতে শোতে আসে না! জোয়ানি উমার আগর থাকত তো আসত। বলতে বলতে যেন ক্ষ্‌ব্ধ র্‌ষ্ট হয়েই চলে গেল সে।

গোপীজীবন সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকল।

পরে তার খেয়াল হল রাত হয়ে যাচ্ছে। ডিসপেনসারি বন্ধ করে ফিরতে হবে। তার বাড়ি খানিকটা তফাতে। প্রায় মাইল খানেক।

গোপীজীবনের একটা সাইকেল আছে। সকালের দিকে সে সাইকেল নিয়েই আসে। বিকেলে বড় একটা সাইকেল আনে না। কোনোদিন সাইকেল রিকশা বা টাঙায় আসে। ফেরার সময় সে হাঁটতে হাঁটতেই ফেরে। তার ভাল লাগে।

ডায়েরি খাতা রেখে দিল গোপীজীবন ড্রয়ারে। টেবিলটা

সামান্য গোছাল। চাবি দিল ড্রয়ারে। তারপর ঘরটা একবার দেখল।

ছোট জানলার দিকে তাকাতেই ছবিটা চোখে পড়ল। ভূতনাথ দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে গিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের ছবি। হরিদ্বারের গঙ্গা। আর মন্দির।

ভূতনাথ না দলবল সামলে হরিদ্বারে যাচ্ছিল। কারা ছিল তার দলে। যারা ছিল—তারা কি কেউ কিছু বলতে পারে! হরিদ্বার যাবার কথাটা গোপীজীবনও শুনেছিল ভূতনাথের মুখে; বিশেষ কান করেনি। বকুলও শুনেছে। বকুল হয়ত জানে বা মনে রেখেছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিল গোপীজীবন। দুমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ছবির গঙ্গায় হাত বুলোলো। কোথায় তুমি যাবার তোড়-জোড় করছিলে ভূতনাথ। আর কোথায় চলে গেলে।

ডিসপেনসারি বন্ধ করে রাস্তায় নেমে হঠাৎ চাবির কথাটাই মনে পড়ল। সত্যিই কি তার ঘরের চাবিটা ভূতনাথ কবুতরীর কাছে ফেলে গিয়েছে? ইচ্ছে করে? না, ভুল করে?

পাঁচ

শুতে এসে বকুল বলল, 'তোমার কাছে ঘুমোবার ওষুধ আছে না?'

গোপীজীবন বলল, 'আছে। কেন?'

'দাও। খাব।'

ডাক্তারের বাড়িতে দু চারটে ঘুমোবার ওষুধ থাকবে না—এমন হতে পারে না। তবে গোপীজীবন এই ধরনের ওষুধের পক্ষপাতী নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে গোপীজীবন বলল, 'মিছেমিছি ঘুমোবার ওষুধ খাবে? এমনিতেই ঘুমিয়ে পড়তে।'

'না। ঘুম আসছে না। সারাদিন চেষ্টা করেও চোখের পাতা এক করতে পারিনি। তুমি ওষুধ দাও।'

গোপীজীবন ঘরের কোণে রাখা দেরাজের টানা খুলল। খুলে ওষুধ বার করল। দিল বকুলকে।

'জল দাও একটু।'

গোপীজীবন জল দিল।

ওষুধ খেয়ে বকুল বলল, 'আমি ভেবে দেখলাম, ভূতনাথ তার মা বাবার মতনই। ওর মাথায় ভূত চেপেছিল। রোগ ছিল ওর। নয়ত এভাবে কেউ মরে না।'

বিছানায় এসে শুতে শুতে গোপীজীবন বলল, 'হবে হয়ত!'

'হবে হয়ত!' বকুল বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। এখনও আলো নেভানো হয়নি। স্বামী তার কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ না করলেও যেভাবে বলল, 'হবে হয়ত—তাতে যেন বোঝা গেল গোপীজীবন কথাটার গুরুত্ব দিচ্ছে না। আচমকা রেগে গেল বকুল—'আমি বলছি? ও ওর মা-বাবার রোগ পেয়েছে, আর তুমি বলছ—হবে হয়ত।'

গোপীজীবন শুয়ে পড়েছিল। শান্ত গলায় বলল, 'জোর করে কি কিছু বলা যায়! মা-বাবার রোগ ছেলেমেয়েরা পাবেই এমন কথা কেউ জোর বরে বলতে পারে না।' বলেই তার কী যেন মনে পড়ে গেল আচমকা। কোনো হাসি-তামাশার লেখায় পড়েছিল। বলল, 'তুমি যা বলছ, তা যদি হত তবে জাপানীদের বংশ নির্বংশ হয়ে যেত। শোনা যায়, এমন কোনো জাপানী পরিবার নেই—যেখানে সেই পরিবারের সাত পুরুষের মধ্যে কেউ না কেউ আত্মহত্যা করেনি।' যুক্তিটা মাথায় আসায় গোপীজীবন যেন নিজের মনেই একটু হাসল।

'তুমি বলতে চাইছ ভূতনাথ শখ করে গলায় দড়ি দিয়েছে?'

'আমি কিছুই বলিনি', শান্তভাবেই বলল গোপীজীবন, যদিও তার বিরক্তি আসছিল। বকুল যা মনে করবে—তাকে হ্যাঁ বলতে হবে? আর বকুলের কথার কোনো ঠিক আছে? এখন যা বলছে, কাল আর বলবে না।

বকুল খুশি হল না। বলল, 'তা বলবে কেন! তোমার স্বভাব হল চুপ করে সব দেখা। দেখো… !,

জবাব দিল না গোপীজীবন।

আরও একটু দাঁড়াল বকুল। নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বলল, তারপর আলো নিভিয়ে এসে শুয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। ঘর অন্ধকার হলেও বাইরের চাঁদের আলোর আভা জানলা দিয়ে ঘরে আসছিল। সন্ধে থেকেই বাতাস বড় উতলা আজ। কাল হোলি। অবশ্য বিহারী পাড়ায় পরশুর হোলিটাই জমজমাট হয়। কালও কেউ ঘরে বসে থাকবে না।

গোপীজীবনের হঠাৎ গত বছরের হোলির কথা মনে পড়ল। ভূতনাথ একটা দল বার করেছিল হোলির। প্রতি বছরেই করত। বাঙালি টোলা থেকে কিছু ছেলে নিত, কিছু জোগাড় করত বিহারী-পাড়া থেকে—তারপর খোল করতাল ভেঁপু নিয়ে শহর তোলপাড় করত। কাদা, নালার ময়লা, রং, আবির, চুনের পোঁচড়া, বার্নিশ কিছুই বাদ যেত না। ভূতনাথকে ছেঁড়া প্যান্টজামা পরিয়ে, একটা আধ-মরা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তার দল বেরিয়ে পড়েছিল। ভূত-নাথের মাথায় তোবড়ানো শোলার হ্যাট, মুখের চারপাশে কালো রঙের কারুকর্ম, হরেক রকম রঙে তাকে চোবানো হয়েছে, ফাগ ঝরছে তার গা থেকে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। দলের ছেলেগুলো ভূতনাথকে ভূত সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে 'হোলি হ্যায়,।

ভূতনাথ দিব্যি দাঁত বার করে বসে নিজেই মাঝে মাঝে ঢোলক বাজাচ্ছে। আবার গানও গাইছে। রাস্তার কুকুরও ওদের সঙ্গী।

সারাটা বেলা আর দুপুর তক এইসব করে বিকেলে ভূতনাথ এল এ-বাড়িতে স্নান করতে। বকুল তাকে ঘরের বারান্দাতেও উঠতে দেবে না। বেরোও বেরোও করছে।

শেষে বাতাসী গিয়ে কুয়াতলায় কাপড় কাচা সাবান, সোডা রেখে এল। একটা পুরনো গামছা। ছেঁড়াফাটা ন্যাতা গোছের এক চাদর। ···ভূতনাথ চেঁচাতে লাগল, কাপড়কাচা সাবান আর সোডা দিয়ে চান করব আমি? ভাল সাবান কী হল? তেল কই? তেল না হলে এই চিটে রং ওঠাব কেমন করে? গোপীদা, তোমার বউয়ের কারবার দেখো। আমি কি ধোপার বাড়ির গাঁঠরি!··· ভদ্দরলোকের ছেলে—!

বকুল চেঁচাচ্ছিলঃ ভদ্দরলোক না মেথর মুদ্দোফরাস! যে চেহারা করেছ তাতে ভদ্দরলোকের সাবান কেউ মাখে না, ওই সোডা আর কাপড় কাচা সাবানেই সাফ হও।

বকুল কিছু মিথ্যে বলেনি। শক্ত বরুশ আর সোডা দিয়ে না ঘষলে ও রং ওঠার নয়।

খানিকক্ষণ চেঁচামেচি হল দু তরফে। তারপর অবশ্য ভূতনাথ স্নান করল। ভাল সাবানও পেল। বকুল একটা পাজামা-দিত পরতে। গায়ে দেবার পাঞ্জাবি। পুরনো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করল ভূতনাথ।

পরের দিন তার জ্বর। দেখতে দেখতে একশো দুই। সন্ধের পর একশো চার।

নিউমোনিয়ার দিকে গড়াবার আগেই গোপীনাথ কোনোরকমে সামলালো ভূতনাথকে।

বকুল হয়ত ওকে এ-বাড়িতেই নিয়ে আসত, কিন্তু যখন শুনল, কবুতরী গিয়ে উঠেছে ভূতনাথের কোঠিতে, তখন খেপে গেল।

বলল, খবরদার—তুমি ওই রাস্তার ভিখিরিকে আমার এখানে আনবে না। তোমার দয়াদাক্ষিণ্য থাকে থাক—তাকে ওষুধ গেলাও বিনি পয়সায়, আমার বাড়িতে ওকে আনবে না। আনলে কুরুক্ষেত্র হবে। ছোটলোক ইতর···নেমকহারাম।

ভূতনাথ সেরে উঠল। কবুতীরই তাকে দেখত।

কিন্তু তারপর কেমন একটা চিড় ধরে গেল—বকুল আর ভূতনাথের মধ্যে। চিড় না বলে ফাটলও বলা যায়। ভূতনাথ অনেকবার যেচে এসে বকুলের মন নরম করার চেষ্টা করেছে। পারেনি।

মাস দুই তিন পরে বকুল নরম হল।

আস্তে আস্তে আবার সহজ হয়ে আসতে লাগল সম্পর্ক। কিন্তু বকুল ওই একটা ব্যাপারে একেবারে অসহিষ্ণু ছিল। কবুতরীর কথা তুললেই সে খেপে যেত।

ভূতনাথ আর কথাটা তুলত না।

এই সময় একদিন এক দৃশ্য দেখেছিল গোপীজিবন। সেদিন তার শরীরটা ভাল ছিল না; ঘাড়ের ব্যাথাটা বেড়েছে, জ্বরজ্বর গা। গোপীনাথ আগে আগেই বাড়ি ফিরল।

বাড়ির ফটকের কাছে ভূতনাথের সঙ্গে দেখা।

দুটো একটা কথা বলেই চলে গেল ভূতনাথ তার ভাঙাচোরা সাইকেলে চেপে।

গোপীজবন ঘরে এল।

ঘর অন্ধকার। সারাদিন বাদলার পর বিকেলটা শুকনো হয়ে উঠেছে। বাতাস ছিল বাদলার গন্ধ জড়ানো। স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব চারপাশে। ঝিঁঝি ডাকছিল বাগানে। বাড়ির বেড়ালটা চৌকাটের পাশে বসে।

গোপীজীবন কোনো সাড়াশব্দ পেল না। না পেয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ। বকুলের এটা গোসাঘর।

তার রাগ হলে, স্বামীর সঙ্গে অ-বিনবনা হলে রাত্রে বিছানা ছেড়ে ও এই ঘরে চলে আসে। এসে শুয়ে থাকে।

কিছু অনুমান করতে না পেরে, ঘরবাড়ি এমন নিঃশব্দ দেখে সে পাশের ঘরের দরজায় ঠেলা দিল। কিসের গন্ধ আসছে?

খুলে গেল দরজা।

আর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গন্ধ। পোড়া গন্ধ। ঘর অন্ধকার। বাইরেও অন্ধকার তখন। আলোর ছিটেফোঁটাও আসছে না।

চোখ সরে এল গোপীজীবনের। এত পোড়া পোড়া গন্ধ কিসের? নাক যেন বুজে আসছে। গোপীজীবন কোনো উগ্র গন্ধই সহ্য করতে পারে না। তার মনে হল, কোনো কাপড়চোপড় যেন কেউ পুড়িয়ে রেখেছে ঘরের মধ্যে। তার গন্ধ। ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে গভীর হয়ে। …গোপীজীবন চমকে গিয়েছিল।

বকুলকে চোখে পড়ল অন্ধকারে। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার পিঠে শাড়ি নেই। মাথার পিছনটান দেখা যাচ্ছিল। খোঁপাটা কালো হয়ে আছে। বকুলের ছড়ানো পায়ের তলায় মাথার বালিশ। যেন মাথা থেকে বালিশটা টেনে নিয়ে পা দিয়ে সেটা চটকাচ্ছিল বকুল।

গোপীজীবনের ভয় কাটল। বাতি জ্বালতে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে, শুয়ে আছ? ঘরে এত পোড়া গন্ধ?'

বাতি জ্বলে উঠতেই বকুল বিশ্রিভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাতি জ্বালবে না; নিভিয়ে দাও।'

গোপীজীবন বাতি নেভাল না। স্ত্রীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। কোনো জামাটামাই যেন আধ-পোড়া হয়ে পড়ে আছে।

'কী হয়েছে কী? ঘরের মধ্যে কী পুড়িয়েছ?"

'তুমি বাতি নেভাও—'

'কী হয়েছে বলবে না ?'

'না।'

'তুমি এসব কী ছেলেমানুষি করছ ?'

বকুল হঠাৎ পাশ ফিরল। উঠে বসল যেন লাফ মেরে। ওর চোখ জ্বলছে, মুখ লাল, মুখের মাংসপেশী কাঁপছে। চিৎকার করে বলল, 'তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

গোপীজীবন প্রচণ্ড চটে গিয়েছিল। কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে এল।

দিন দুই পরে গোপীজীবন জানতে পারল, ভূতনাথ নাকি একটা জামা রেখে গিয়েছিল বকুলের কাছে। অল্পস্বল্প সেলাই করে দিতে হবে ; আর ছেঁড়া বোতাম দু'তিনটে বসিয়ে দিতে হবে জামায়।

সেই জামা নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি। বকুল জামা সেলাই করেনি, বোতামও বসায়নি। উলটে ভূতনাথকে বলেছিল, ও জামার আছেটা কী যে সেলাই করব। টাঙাঅলারাও ওর চেয়ে আস্ত জামা পরে। আমি তো ছেঁড়াপচা জামা জমিয়ে রাখি না বাড়িতে। ফেলে দিয়েছি। টাকা নিয়ে যাও—একটা জামা কিনে নিও বাজার থেকে।

জবাবে ভূতনাথ কিছু বলেছিল। আঁতে লেগে গেল বকুলের। সেই জামা টেনে এনে ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিল বকুল।

আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছিল ভূতনাথ—দিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গোপীজীবনের মনে হয়েছিল, আগুন তো জামায় লাগেনি শুধু, বোধহয় দুজনের মনেও লেগেছিল।

ভূতনাথ ছন্নছাড়া, খাওয়া-পরার সাধারণ চিন্তাটাও যেন ওর নেই, গা-লাগায় না কোথাও, মান-সম্মান নিয়ে ওর মাথা ব্যথা

নেই। তা বলে ভূতনাথ কি যখন তখন যে-কোনো গ্লানি অপমান অবজ্ঞা সয়ে যাবে!

আর বকুলই বা কেন এমন আচরণ করবে যা অত্যন্ত রূঢ়, ইতরজনোচিত? ভূতনাথকে সে যখন গালমন্দ করে—মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তবু ভূতনাথ ভাবত, বকুল-বউদির ওসব মুখে, মনে নয়। মনে মনে সে ভূতনাথকে স্নেহ করে, ভালবাসে! ফলে বকুলের দুর্ব্যবহার দুর্বাক্য সহ্য করে নিত ভূতনাথ, গা করত না। কিন্তু কখনো কখনো যে মুখ আর মনের মধ্যে মিল থেকে যায়। বকুল এক এক সময়ে মন থেকেই ভূতনাথকে ঘৃণা করেছে।

বকুল আর ভূতনাথের সম্পর্কের মধ্যে আবার একটা গিঁট লেগে গেল। মাসখানেক কেউ আর মুখ দেখাদেখি করল না। শেষে বকুলই একদিন একটা চিঠি পাঠাল ভূতনাথকে। গোপীজীবনই দিল ওকে। বলল, 'কী যে করিস তোরা!'

ভূতনাথ এল আবার। বকুল নাকি রগড় করে ভূতনাথের পায়ে এক মগ জল ঢেলে দিয়ে বলেছিল—'আসুন ভূতবাবু, আপনার পা ধুইয়ে আমার মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে আপনাকে ঘরে তুলি! বাব্বা, এত রাগ!'

গোপীজীবন পুরনো কথা ভাবছিল এলোমেলোভাবে। হঠাৎ বকুলের গলা শুনল। খেয়াল করেনি সে।

"আমায় কিছু বললে?" গোপীজীবন বলল।

"বলেছি। কানে যায়নি। কী ভাবছিলে?"

"না। বলো!"

"ভূতনাথের মায়ের কী যেন গোলমাল ছিল?"

"গোলমাল! আমি জানি না!"

"ন্যাকামি করো না। ওর মায়ের সঙ্গে মহেশবাবুর ·"

"বকুল!"

"যা শুনেছি তাই বলছি। বানিয়ে বলছি না। আমি কি তখন এখানে ছিলাম যে চোখে দেখে বলছি! তুমি এমন করছ…"

"লোকের কথা বাদ দাও। এসব কথাও আমার ভাল লাগছে না। ছেলেটাকে কাল নিজের হাতে পুড়িয়ে এলাম। এখন যত বাজে কথা—"

"আমি একটাও বাজে কথা বলছি না। তুমি একলাই ভূতনাথকে ভালবাসতে? আমি বাসতাম না। সে আমার ওপর কম অত্যাচার করেছে? তুমি তো দাদা সেজে বসে থাকলে!"

গোপীজীবন বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার কথা বাদ দাও। তোমার যদি এতই অপছন্দ ছিল ওকে—বউদি না সাজলেই পারতে। ও কি জোর করে তোমাকে বউদি সাজিয়েছিল? … যাক গে, এসব কথা থাক। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ঘুমের ওষুধ খেয়েছ, মাথা গরম করো না, চুপ করে শুয়ে থাকো—নয়ত ঘুম আসবে না।"

বকুল চুপ করলে না সঙ্গে সঙ্গে; বলল, "আমি সাজিনি, ও আমায় সাজিয়ে নিয়েছিল। ওর কাছে কাউকে সাজতে হয় না, নিজেই সাজিয়ে নেয়।"

চুপ করে থাকল গোপীজীবন। বকুল একেবারে মিথ্যে বলেনি। এক একজন মানুষ এই রকমই হয়, তাকে ডাকতে হয় না, বসাতেও হয় না—নিজেই আসে, বসার জায়গা পাকা করে নেয়।

"তোমার ভূতনাথকে আমি ঘাড়ে করে এ-বাড়িতে আনিনি। তুমিই এনেছিলে। এনে সেই ভূত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলে। আমি ওর মা নই, দিদি নই, বোন নই—তা সত্ত্বে কম বায়নাক্কা করেছে। …মরেছে—মরেছে। কিন্তু আমার জন্যে মরেনি।"

গোপীজীবনের মনে হল বকুল যেন আত্মরক্ষার জন্যে মরিয়া

হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন? কেন সে নিজের মধ্যে এক অপরাধ-বোধ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে?

গোপীজীবন মৃদু গলায় বলল, "তুমি কী পাগলামি করছ? তোমার জন্যে ভূতনাথ গলায় দড়ি দেবে কেন?"

"তা হলে?"

"জানি না।"

"ওর মা-বাবার রোগও ও পায়নি বলছ?....তবু একটা জলজ্যান্ত ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরল!"

"মরেছে।....এখন তোমার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, ঘুমোও। জগতে কত কী ঘটছে, সব জিনিসেরই কি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়! বাইরে থেকে অন্তত পাওয়া যায় না। তুমি ঘুমোও।"

বকুল চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ উঠে পড়ল। জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল আবার।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

হাই উঠছিল গোপীজীবনের, কিন্তু ঘুম আসছিল না।

ভূতনাথের মা-বাবার কথাই ভাবছিল গোপীজীবন। এই দুই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে সে দেখেনি। দেখার কথাও নয়। ভূতনাথের বাবা অনেক দিনই বিগত, মা বছর সাত-আট আগে। গোপীজীবনকে ভূতনাথ কিছু বলেনি, তবে সে শুনেছে। শুনেছে ভূতনাথের বাবা ফ্রুট প্রিজার্ভিংয়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর একটা ছোট কারখানা ছিল। মোরব্বা, আচার, স্কোয়াশ— এইসব তৈরি করতেন, করে কাছাকাছি দু-দশ জায়গায় বিক্রির জন্যে পাঠাতেন। মোটামুটি চলত ব্যবসাটা। এদিকে ফলপাকা। একটু বেশিই পাওয়া যায়, যেমন আম, জাম, পেয়ারা। ভদ্রলোক ব্যবসার ধাত বুঝতেন না, কিন্তু তাঁর জ্ঞানগম্যি ছিল। তা ব্যবসায় আজকাল যেটা প্রয়োজন—সেই অর্থ—অজস্র অর্থ আর

বাজারে মাল কাটাবার ব্যবস্থা তাঁর ছিল না। ফলে ব্যবসা কোনোদিন বাড়েনি। বরং দিন দিন গুটিয়ে আসছিল।

উনি আত্মহত্যা করেছিলেন বলে শোনা যায়। কারণ অজানা। লোকে তো যে যার মতন করে বানানো গল্প বলে। সেই সব গল্প এক একটা এক একরকম। কেউ বলে দেনার দায়ে অপমান সইতে সইতে, কেউ বলে স্ত্রীর জন্যে, কেউ বা বলে উনি খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে গাঁজার নেশা ধরেছিলেন। কোনটা সঠিক, কোনটা বানানো বলা যায় না।

ভূতনাথের মা ছিলেন—বিরজাদেবী প্রসূতি সদনের ধাত্রী। তিনিই বড় ধাত্রী। প্রসূতি সদনের বিশ পঁচিশটি বিছানার তিনিই ছিলেন দেখাশোনা করার দায়িত্বে। পুরুষ ডাক্তার সেখানে প্রয়োজন ছাড়া ঢুকতে পারত না। আধ-বুড়ি এক মেয়ে ডাক্তার ছিল রোগী দেখার জন্যে। শহরের সাধারণ, গরিবগুর্বোদের জন্যেই হাসপাতালটা খোলা থাকত।

ভদ্রমহিলার বৈধব্যদশার দিনগুলো হাসপাতাল আর ছেলেকে নিয়ে কেটে যাচ্ছিল। থাকতেন লালাবাবুর মহললায়। তা উনি, লোকে বলে, মহেশবাবুর হাতে পড়েছিলেন। মহেশবাবু হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি প্রতিনিধি। হাসপাতালের মালিকদের সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল। ভদ্রমহিলাকে পেটের দায়ে মহেশবাবুকে খাতির করে চলতে হত।

কবুতরী কাজ করত ভূতনাথের মায়ের সঙ্গে। মহিলা নিজে অনেক সময় এই শহরের এ-বাড়ি সে-বাড়িতে গিয়ে বউদের প্রসব করিয়ে আসতেন। বিশেষ করে বাঙালি বাড়িতে। কবুতরী তাঁর সঙ্গে থাকত।

কবুতরী নাকি মহিলার বাড়িতেই থেকে যেত অর্ধেক দিন। তাঁর সাংসারিক কাজেও সাহায্য করত।

ভূতনাথ যখন বড় হয়েছে, সদ্য যুবক, তখন মহিলাও চলে

গেলেন। রহস্যময় মৃত্যু। কেউ বলে ব্যাধি, কেউ বলে মহেশ-বাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পরিণতি....।

গোপীজীবন এসব কথা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি। তার ভদ্রতায় সৌজন্যবোধে বাধত। উড়ো খবরের মতন যা কানে আসত—শুনত, পছন্দ করুক আর না-করুক।

কবুতরীকেও কোনোদিন কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি গোপী-জীবন। অথচ ওর মুখেই সে শুনেছে, ভুতিয়াকে নিয়ে কবুতরী কম জ্বলেনি। ছেলেটা কবুতরীকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিত না।

তারপর, মা মারা যাবার পর ভূতনাথ নিজের মতন থেকে গেল। কবুতরী পড়ল নিজেকে নিয়ে। একসময়, বারো তেরো বছর বয়সে, বিয়ে হয়েছিল কবুতরীর। তার স্বামী কিউল স্টেশনে চাকরি করত। খালাসির চাকরি। সে একদিন রেলে কাটা পড়ে। মারাও যায়।

কবুতরী যখন যুবতী তখন সে দুচারটে মরদের সঙ্গে মেলামিশি করেছে বটে কিন্তু বিয়ে হয়নি। টুলুয়া সেপাইকে তার মনে ধরেছিল। কিন্তু কোন জায়গায় যে ভেগে পড়ল টুলুয়া কে জানে! বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে—তাই বা কে জানে!

কবুতরীর এখন পেট চলে দু চার রকম কাজ করে। সে বেসম তৈরি করে চাকি ভেঙে, পাঁপর বানায়, গিরিধারীর দোকানের আচার তৈরি করে আম আর লেবুর। তার ভালই চলে যায়। কখনো কখনো সীতপতি রামলালদের নিয়ে ঘরে বসে রঙ্গ করে। মাঝে মধ্যে দিশি মদ খায়।

গোপীজীবনের মনে হল, বকুল কেমন একটা শব্দ করল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কেঁদে উঠল নাকি?

স্ত্রীকে দেখল গোপীজীবন। বেঁকে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। পাশবালিশটা আঁকড়ে আছে এমন করে যেন ওই বস্তুটা তার সহায়।

বকুলের একটা হাত পাশবালিশটার তলায়, অন্য হাত দিয়ে সে বালিশ খামচে ধরেছে।

গোপীজীবন পাশ ফিরল।

ভূতনাথ কেন আত্মহত্যা করল—তা কি জানা যাবে না ?

'কবুতরী ?'

'ডাগতারবাবু ?'

'তোর কাছে ভূতনাথ তার ঘরের চাবি ফেলে গেল কেন ? ফেলে গেল, না, ভুল করে রেখে গিয়েছিল ? তার জামার পকেট থেকে পড়ে যায়নি তো ?'

'আমার মালুম নেই।....আমি তো বাদে দেখলাম। ওহি চাবি ভুতিয়ার না দোসরা কার....'

'দোসরা ? তোর ঘরে দোসরা আদমি কে আসবে ?'

'কোহি নেহি।....ভাগবত, ঝুমরু—ওহি শালারা বসে বসে ভাং-উং খাচ্ছিল, দারু ভি খেল একদিন....হোলি না—?'

'চাবিটা আমায় দিবি কাল ?'

'ভুতিয়ার ডেরায় যাবেন ?'

'যাব।'

'আমিও যাব।'

'পরে যাস।'

ছয়

বিকেলের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গোপীজীবন। বকুল বলল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"ঘুরে আসি।"

"তোমার ডাক্তারখানা বন্ধ।"

হোলির দিন এই শহরের সবই প্রায় বন্ধ থাকে। দোকান, পশার হাট বাজার খোলা রাখার কথা কেউ ভাবে না। তবু দু-একটা পানঅলা মিঠাইঅলাকে বসে থাকতেই হয়।

গোপীজীবনের ডাক্তারখানা সকালে বন্ধ ছিল। এ-বেলাও খোলার দরকার করে না। কিন্তু আপাতত সে ডাক্তারখানায় যাচ্ছে না, যাবে কবুতরীর কাছে। কবুতরীর কাছ থেকে চাবি নেবে ভূতনাথের বাড়ির। সেখানেই যাবে।

কথাটা বকুলকে বলল না গোপীজীবন। বলে লাভ নেই। অকারণ কথা কাটাকাটি হবে হয়ত, কিংবা বকুল অন্য অশান্তিও করতে পারে। কবুতরীর বাড়িতে নিজের ঘরের চাবি ফেলে যাবে কেন ভূতনাথ? কবুতরী তার কে? ও মাগী মিথ্যে কথা বলেছে। নয়ত....নয়ত নিজেই পকেট থেকে বের করে রেখে দিয়েছে। রঙ্গ করেছে।

গোপীজীবন কথা বাড়িয়ে বেরুবার তিক্ততা সৃষ্টি করতে চায় না। বলল, "একটু কাজ আছে। কিছু ওষুধপত্র আনতে হবে। কি আছে না আছে ভাল জানি না। খাতা দেখে ফর্দ করে রাখব" —কথাটা শেষ না করেই আবার বলল, 'ফিরে আসব তাড়াতাড়ি।'

বকুল আর কিছু বলল না।

গোপীজীবন বাইরে বারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'কেদার যদি আসে বলো আমি বেরিয়েছি।'

'কেদার বাবু আসবেন?'

'জানি না। দোলের দিন, দু একজনকে নিয়ে আসতেও পারে সন্ধেবেলায়।'

বারান্দা থেকে নামার সময় গোপীজীবন এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বাড়ির কোথাও রং-টং ছিটিয়ে নেই। অন্য অন্যবার যত্রতত্র জল রঙের দাগ থাকে, আবিরের গুঁড়ো ওড়ে এখানে ওখানে। এবারে কিছু নেই।

বকুলের কয়েকজন বন্ধু চেনাজানা মেয়ে আছে। তারা দোলের দিন বাড়িতে আসে রংয়ের বালতি আর আবির নিয়ে। হইচই করে খানিকটা চলে যায়। এবারে বকুল তাদের আসতে দেয়নি। ফটক থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। ফটকের কাছেই খানিকটা আবির পড়েছিল।

ভূতনাথ সকালে আসত না, সারা বেলা শহর তোলপাড় করে দুপুরের পর সে আসত। স্নান করত কুয়াতলায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টা দুই ধরে। সন্ধের দিকে বকুলের সঙ্গে আবির ছোঁড়াছুঁড়ি করত। তারপর খেয়ে দেয়ে রাত্রে ফিরত।

ভূতনাথ নেই। এ-বাড়িতে দোলও নেই এবার। বকুলের বিমর্ষ আহত ক্ষুব্ধভাব এখনও কমেনি। সে যেন কেমন এক অন্যমনস্কতা, অশান্তির ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

গোপীজীবন হাঁটতে লাগল। কাছাকাছি কোনো সাইকেল রিকশা দেখল না।

চাবিটা হাতে তুলে দিয়ে কবুতরী বলল, 'আমি যাব ডাগ্‌তার-বাবু?'

'না, তুই থাক।'

'আমার তবিয়াত ঠিক আছে।'

'আমি তোকে দেখছি, তুই কি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিস? তোর তবিয়াত খারাপ। ঘরে থাক। কোথাও যাবি না।.... কপালটার কী অবস্থা করেছিস?'

অন্য অন্য বার হোলির দিন কবুতরীকে দেখলে মনে হয়, নেশা মেয়েটাকে গিলে খেয়েছে। বেলার দিকে তাকে না দেখলেও সন্ধের সময় ওকে দেখেছে গোপীজীবন। সে-এক হাস্যকর মূর্তি। কখনও হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে বেঁকে দাঁড়িয়ে দুহাতে তালি মেরে মেরে অকথা কুকথা বলছে, টলছে, রঙ্গ করছে, নেশায় চুর, কখনো

আবার শাড়িটাকে ঘাঘরার মতন পেঁচিয়ে পরে এক নাগাড়ে নাচছে ঘুরে ঘুরে। তার গলার স্বর ভাঙা, বসা, চোখ টকটকে লাল, মাথার চুল ঝুঁটি বাঁধা।

কবুতরীকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছিল। শোক যেন তার জীবনীশক্তির উৎসটাকেই শুকিয়ে দিয়েছে।

গোপীজীবন চলে যেতে যেতে বলল, 'আমি ঘুরে দাবাইখানায় আসব। তুই আসিস। কপালে দাবাই লাগিয়ে নিবি। খাবার দাবাইও দিয়ে দেব।....এখন ঘরে থাক।'

চলে গেল গোপীজীবন।

ডাক্তারখানায় ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধে। গোপীজীবন আলো জ্বালল।

পিপলি গলিতে যেন হললার তোড় এখন একটু কম। আর খানিকটা পরে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনার হুল্লোড় পড়ে যাবে। সারাদিনের হইচইয়ের পর—এই সন্ধের মুখে বুঝি সামান্য ক্লান্তি নেমেছে এখানে।

ঘরের পেছন দিকে জানলাটা খুলল না গোপীজীবন। লাভ নেই। অন্ধ সরু গলি আর একটা ডুমুর গাছ, আলোবাতাস আসার উপায় নেই।

গোপীজীবন তার জায়গায় বসল। বসার আগে কাগজে মোড়া কী একটা একপাশে রেখে দিল। দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। পকেট থেকে ভূতনাথের বাড়ির চাবিটা বার করে রেখে দিল টেবিলের ওপর।

সিগারেট শেষ হল। গোপীজীবন অন্যমনস্কভাবেই বসে থাকল। ও যেন স্থির করে কিছুই ভাবতে পারছিল না। অজস্র ভাবনা, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক থাক না থাক—মনের মধ্যে

ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল। গোপীজীবন স্বস্তি পাচ্ছিল না, শান্তি পাচ্ছিল না।

অন্যমনস্কভাবেই কখন যেন তার ডায়েরি খাতাটাও বার করল। খাতার দিকে না তাকিয়েই পাতা ওলটাল। বন্ধ করল খাতাটা।

কবুতরীকে দেখতে পেল গোপীজীবন, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আয়—!"

ভেতরে এল কবুতরী।

"দাঁড়া, আগে তোর কপালের ঘা পরিষ্কার করে দিই।"

নিজেকেই উঠতে হল গোপীজীবনের। তুলো, রেকটিফায়েড্ স্পিরিট জোগাড় করে আনল।

"ডাগতারবাবু?"

"তোর ভুতিয়ার ডেরায় গিয়েছিলাম। ···দেখি, কপালটা ফেরা। একেবারে গর্ত করে ফেলেছিস। দাঁড়া....একটু জ্বালা করবে।" গোপীজীবন তুলোয় স্পিরিট মাখিয়ে কপালের ঘাগুলো মুছে দিতে লাগল।

জ্বালা করছিল কবুতরীর। কিছু বলল না।

"মলম লাগিয়ে দিচ্ছি। নোংরা লাগাবি না।" তুলোটা ময়লা-ফেলা ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে মলম খুঁজতে ওষুধের আলমারির কাছে গেল। "তোর কি বুখার?"

"না।"

"হয়েছে মনে হল।" মলম নিয়ে ফিরে এল গোপীজীবন। "মলম দিয়ে দিচ্ছি। ওষুধও নিয়ে যা, খাবি। ঘা পেকে গিয়েছে। বুখার বাড়বে দাবাই না খেলে।"

গোপীজীবনের মলম লাগানো শেষ হলে কবুতরী বলল, "ভুতিয়ার ঘরমে কুছ দেখলেন?"

গোপীজীবন মলমের টিউবটা কবুতরীর হাতে দিয়ে ডিসপেন-

সারির খুপরির দিকে চলে গেল। ছোট ড্রামে জল থাকে হাত ধোওয়ার। গতকালের জল সামান্য ছিল। হাত ধুয়ে আবার ওষুধের আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মনেই কী-যেন বলল। তারপর ওষুধের একটা পাতা নিয়ে ফিরে এল।" এটা নিয়ে যা। আজ রাতেই দুটো বড়ি খেয়ে নিবি। কাল সকালে দুপুরে আর রাতেও খাবি দুটো করে। পরশু আবার ওষুধ নিয়ে যাবি।"

কবুতরীর উৎসাহ ছিল না ওষুধ নিতে, নিতে হবে বলেই হাত বাড়াল। বলল, "ভুতিয়ার ডেরায় কী মিললো ডাগতারবাবু?"

গোপীজীবন মাথা নাড়ল। "কিছু না। ইধার-উধার সব পড়ে আছে। এত ময়লা ধুলো, নোংরা—ওর মধ্যে থাকত কেমন করে কে জানে!" বলেই একটু থেমে হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, বলল, "ওর মায়ের ছবিটা নিচে পড়েছিল। শিশা টুটা। ছবিতে তুইও আছিস।"

কবুতরী প্রথমে কিছু বলল না, তারপর মাথা নাড়ল। সে জানে।

"ভূতনাথের মা, ভূতনাথ আর তুই!"

কবুতরী বলল, "বিজুবাবু ফটুয়া লিয়েছিল। ভুতিয়া পনারা ষোলো সালকা।"

"তুইও তো জোয়ানি ছিলি!"

"বিশ বাইস সালকা।"

গোপীনাথ হঠাৎ বলল, "ভূতনাথের মায়ের কাছে তুই কতদিন ছিলি?"

"সাত আট সাল।"

"মা মারা গেল, তুই...."

বাধা দিয়ে কবুতরী বলল, "মা মারনে কো বাদ—দেড় দো সাল আমি ভুতিয়াকে দেখেছি। আমার জিম্মাতে ছিল বদমাশ। বহুত ঝনঝটিয়া ছিল ভুতিয়া। হারামজাদ...."

গোপীজীবন না হেসে পারল না। কব্‌তরীর কাছে ভূতনাথ ওই রকমই ছিল। কখনো ভাইয়া, কখনো হারামজাদ বদমাশ। কখনো শালা। গোপী নিজের চোখেই দেখেছে, কাঠের পিঁড়ি ছুঁড়ে কব্‌তরী মারতে যাচ্ছে ভূতনাথকে, ভূতনাথ হাসতে হাসতে পালিয়ে এসেছে গোপীজীবনের ডাক্তারখানায়। এসে বলছে, গোপীদা—ওকে বললাম—তুই হলি চণ্ডালের মেয়ে, তোর অত গঙ্গামাইয়ার মিট্টি মাখার শখ কেন? চল তোকে আড়াইহার পচা খালে ফেলে আসি। ....তা ও আমায়....

কব্‌তরী চণ্ডালের মেয়ে নয়। কিন্তু চণ্ডালের মেয়ে বললে ভীষণ চটে যায়। ভূতনাথও ওকে খেপাবার জন্যে এইসব বলত কখনো সখনো। কোন মানুষের কার কোথায় লাগে কে বলতে পারে। কব্‌তরীর বড় সাধ—সে তিন গঙ্গায় স্নান করবে একদিন না একদিন। কাশীর গঙ্গা, পাটনার গঙ্গা আর হরদোয়ারের গঙ্গা। ভূতনাথ তাকে খেপাত—বলত—তুই গঙ্গায় স্নান করবি কী রে! তুই পাপী! তোর অত কপালজোর নেই। তুই আস্‌নান করতে গেলে গঙ্গামাই শুখা হয়ে যাবে। ....ভূতনাথের কথায় খেপে যেত কব্‌তরী। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত তাকে।

গোপীজীবনের মনে হল, কব্‌তরীকে আর বসিয়ে রেখে লাভ নেই। মেয়েটার গায়ে জ্বর। বেশি নয়। হয়ত রাত্রে জ্বর হবে।

"তুই যা—শুয়ে থাকগে যা—" গোপীজীবন বলল।

কব্‌তরীর চোখ ঘোলাটে হয়ে আছে। কপালের কাছে ফোলা। গলার স্বরও বসা, ভাঙা। সে বলল, "ভুতিয়ার চাবি!"

"নিয়ে যা।"

মাথা নাড়ল কব্‌তরী। "না।"

"রেখে দে তোর কাছে।"

"কী হবে ডাগতারবাবু? রাখ্‌ দিন। চাবি নিয়ে কী হবে! ভুতিয়ার ঘর বন্‌ধ হয়ে গেল—চাবি লিয়ে কী করব!"

কবুতরী বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

গোপীজীবন বলল, "কিছু খেয়েছিস ?"

"থোড়া।"

"রাতে কিছু খাবি। ওষুধটা খেতে শুরু কর। নয়ত জ্বর হবে।"

কবুতরী আর কিছু বলল না। চলে যাচ্ছিল।

গোপীজীবনের কী মনে হল, বলল, "চাবিটা আমার কাছেই থাকল।....তোর দরকার লাগলে বলিস!....দু দশদিন যাক, অর্জুন-বাবুর মোকান, ফেলে তো রাখবে না। ঘর খালি করে দিতে হবে। ভূতনাথের জিনিসগুলো তুই নিয়ে আসিস।"

কবুতরী মাথা নাড়ল। নিয়ে আসবে সে।

চলে গেল কবুতরী।

গোপীজীবন ঘড়ি দেখল হাতের। সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। এখন সে চলে যেতে পারে। বা আরও কিছুক্ষণ থাকলেও ক্ষতি নেই। বকুলকে অবশ্য সে বলে এসেছে তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু তার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় কি বকুল বসে থাকবে! হয়ত পাড়ার দু-একজন মেয়ে—যারা সকালে দোল খেলতে এসে ফিরে গিয়েছিল তারা সন্ধেবেলায় দেখা করতে এসেছে। বা গানের মাস্টার। গানের মাস্টারকে এ ক'দিন আর দেখা যাচ্ছে না বাড়িতে। বকুল এদের কারও সঙ্গেই প্রাণ খুলে গল্প গুজব করতে পারবে না ঠিকই—কিন্তু ভদ্রতাবশে তাড়িয়ে দিতেও পারবে না। খানিকটা সময় কেটে যাবে বকুলের।

গোপীজীবনের এমন কিছু তাড়া নেই। সেই অনায়াসে তার ডায়েরি খাতায় কয়েকটা কথা লিখে ফেলতে পারে।....খাতাটা আবার খুলল গোপীজীবন।

কলম নিল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর লিখতে লাগল।

"কবুতরীর কাছ হইতে ভূতনাথের আস্তানার চাবি লইয়া আজ

আমি তাহার ডেরায় গিয়াছিলাম। কেন গিয়াছিলাম আমি জানি না। যে-মানুষটি আর নাই, আমাদের বোকা বানাইয়া, দুঃখ দিয়া হঠাৎ চলিয়া গেল তাহার ফাঁকা ঘরে যাইবার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমি পুলিসের লোক নই, থানার দরোগা নই যে কোনো-না-কোনো কারণে ভূতনাথের বাড়ি তল্লাসি করিতে যাইব। গোয়েন্দাগিরি করিবারও কোনো কারণ নাই। তবু আমি গিয়েছিলাম। না গিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। শান্তি হইতেছিল না। আমার এমন কৌতূহলের কি ব্যাখ্যা দিব? আমার মাথায় আসিতেছে না। ভূতনাথের এই আকস্মিক আত্মহত্যার কোনো কারণ যদি খুঁজিয়া পাই—বা এমন কোনো সূত্র যাহাতে বুঝিতে পারি ছেলেটা কেন মরিল—তাহা হইলে যেন খানিকটা স্বস্তি পাই—এই উদ্দেশ্য লইয়াই সেখানে যাইতে পারি। ইহা ছাড়া আমার আর কী বলিবার আছে!

"ভূতনাথের ডেরায় আমি আগেও গিয়াছি। কখনো সখনো, কোনো কাজে। অনেক দিন পর তাহার ডেয়ায় গেলাম। দরজার তালা খুলিবার সময় আমার মনে হইতেছিল—এমন যদি হয়—ঘর খুলিয়া দেখি ভূতনাথ বিছানায় শুইয়া আছে—তাহা হইলে? এমন একটি ভৌতিক দৃশ্য দেখিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না—তবু মানুষের মন বলিয়া কথা। অসম্ভবকেও আমরা কল্পনা করি।"

"ঘর খুলিয়া দেখি, কোথাও কিছু নাই। জানলা বন্ধ। অন্ধকার জমিয়াছে। বাতাস বড় ভারী, দম বন্ধ হইয়া আসে। ঘরের জানলা ও পিছনের কপাট খুলিয়া দিলাম। বন্ধ ঘরে বাতাস ঢুকিল।

"ভূতনাথ যে ছন্নছাড়া হইয়া থাকিত—তাহা আমি জানি। কিন্তু দিন দিন সে যেন আরও ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের কী

চেহারা ! একটা সরু তক্তপোশের উপর ছেঁড়া তোশক, চাদর, চটকানো বালিশ। ময়লা। গন্ধ উঠিতেছে। টিনের ভাঙা কৌটায় পোড়া বিড়ি সিগারেট। ঘরের এখানে ওখানে ছেঁড়া পাজামা, জামা, লুঙ্গি ছড়ানো। শতছিদ্র এক গামছা। এক গোছা পুরানো খবরের কাগজ, দু পাঁচটা ছেঁড়াফাটা বই, একটা টাইমটেবল্। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে কাগজে মোড়া ছাতু খানিকটা। ভাঙা সরাই। একটি গ্লাস। ঘরের এক কোণে এক কেরাসিন স্টোভ, ইকমিক কুকারের দু-তিনটি বাটি। মেঝেতে অজস্র ধুলো, ঘরের চারদিকে ময়লা আর ঝুল। দেখিলে মনে হয়, এ-ঘরে কোনো মানুষ থাকিত না।

"লণ্ঠনে বোধ হয় তেল ছিল না। আধপোড়া এক মোমবাতি ছিল। মোমবাতি জ্বালিলাম।

"ভূতনাথ কিছু কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে ?....কোথাও কিছু দেখিলাম না। দুটি জিনিস অবশ্য নজরে পড়িল। ঘরের কুলঙ্গির গর্তে একটি কানাভাঙ্গা কাচের প্লেট। প্লেটে কয়েক টুকরা ছেঁড়া রুটি। পোড়া, কালো। একটু গুড়। অজস্র পিঁপড়া ধরিয়াছে। কালো পিপঁড়ায় যেন রুটির টুকরাগুলি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

"বকুলের এক পাটি চটিও আমার নজরে পড়িল। অবাক হইবারই কথা। বকুলের পায়ের চটি এখানে কেন ? চটি সম্বন্ধে বকুলের দুর্বলতা আছে, শখ আছে। বছরে কমপক্ষেও তিন জোড়া চটি না হইলে তাহার চলে না। বাড়িতে বকুলের বিস্তর চটি জমিয়াছে, সবই আর ছেঁড়া কি রং-ওঠা নয়। এই চটিটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়া। ইহা যে বকুলের আমি জানি।

"ভূতনাথের ঘরে আর তো কিছু দেখিলাম না।

"কবুতরীর ডেরা হইতে ভূতনাথ আর তাহার ঘরে ফেরে নাই। ঘরের চাবিটি সে কবুতরীর কাছেই রাখিয়া আসিয়াছিল, না, ভুল করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল তাহা বলা মুশকিল। ভুল করিয়া

ফেলিয়া আসিলে সে কি একবার তাহার ডেরায় যাইত না? মনে হয়, ভূতনাথ তাহার ঘরের চাবিটি কবুতরীর কাছেই রাখিয়া আসিয়াছিল। কিছু বলে নাই।

"ভূতনাথ তাহার পর কোথায় গিয়াছিল কে জানে!

"আমার পক্ষে আর ওই ঘরে দাঁড়াইয়া থাকার কোনো কারণ ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। ঘরের পিছনের কপাটের মাথায় টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। বাতাস আসিল এক দমক। মোমবাতির ম্লান আলোয় সমস্ত ঘরটি শুধু যে মলিন দেখাইতেছিল তাহা নয়—মনে হইতেছিল ভূতনাথ যেন কোনো অদৃশ্য ও অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতেছে।

"মানুষ বড় অদ্ভুত। ভুতনাথ যে কেন তাহার ঘরের চাবি ফেলিয়া গেল কে জানে! চাবি থাকায় আমি তাহার ঘরের তালা খুলিতে পারিলাম ঠিকই—কিন্তু তাহাকে কী জানিতে পারিলাম! অনেককাল পরে তাহার এই অ-বাসযোগ্য, ধুলাময়লায় মলিন, বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের মতন ছড়ানো-ছিটানো দারিদ্র্য ও দীনতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলাম—তাহা নিতান্তই ভূতনাথের মাথা গোঁজার স্থান, তাহার বাসা। কিন্তু ঘর তো মানুষ নয়। মানুষটিকে কি দেখিতে পাইলাম?

"জানালা দরজা এবার বন্ধ করা দরকার। ঘরের দেওয়ালের ছায়া ঘন হইয়া আসিতেছিল। মোমবাতির শিখাও নিভিয়া আসিতেছে।

সাত

গোপীজীবন বাড়ি ফিরে দেখল, বকুল ভেতরের বারান্দায় চুপ করে বসে আছে। সামনে ছোট চাতাল, কয়েকটা পাতাবাহারের

টব, তফাতে পাঁচিল, পাঁচিলের গা-ধরে এক শিউলিগাছ। পূর্ণিমার আলোয় চাতাল ভেসে যাচ্ছিল, বারান্দার মাঝামাঝি পর্যন্ত জ্যোৎস্না এসেছে।

গোপীজীবন বলল, "কেউ আসেনি ?"

বকুল যেন শুনতে পায়নি কথাটা। কোনো জবাব দিল না। গোপীজীবন আবার বলল।

বকুল বলল, "কেদারবাবুরা আসেনি।"

'ও! তা পাড়ার মহিলারা ?'

'না। ওদের আজ গান-বাজনা হচ্ছে ভট্টশালীর বাড়িতে। সেখানে আছে।'

গোপীজীবন আর জিজ্ঞেস করল না, তুমি গেলে না ? বকুল যে যাবে না—এটা তো বোঝাই যায়।

বকুলই বলল, 'তুমি বললে তাড়াতাড়ি ফিরবে। এই কি তাড়াতাড়ি ?'

'কই, রাত তো হয়নি। সোয়া আট!'

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?'

গোপীজীবন অবাক হল। 'কেন ?'

'মহেশবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল।'

'কখন! আমি তো সন্ধের সময় থেকে ডাক্তারখানায় ছিলাম।'

'ও তোমায় পায়নি।'

গোপীজীবন থতমত খেয়ে বললে, 'ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটা কাজ সেরে আসতে গিয়েছিলাম। তারপর তো ডিসপেনসারিতে। কই কেউ তো যায়নি। কী বলল মহেশবাবুর লোক ?'

'তোমায় ডেকেছেন।'

গোপীজীবন হঠাৎ চটে গেল। 'ডেকেছে মানে! আমি ওর চাকর!'

'ওঁর বউয়ের জন্যে···

'যার জন্যেই হোক—! ইমারজেন্সি হলে বুঝতাম। যে-মানুষ আজ হপ্তা তিনেক ধরে ভুগছে আমি তাকে তিনদিনে সারিয়ে দেব! আমি ধন্বন্তরি!…এসব মানুষ ভাবে কী! হুকুম করলেই ছুটতে হবে।' বলতে বলতে সে আর দাঁড়াল না, জামাকাপড় বদলাতে চলে গেল।

বকুল উঠল না, বসে থাকল যেমন ছিল সেই ভাবেই।

গোপীজীবনকে চা তৈরি করে দিল বাতাসী। ঘরে বসে চা-খাওয়া প্রায় যখন শেষ করেছে সে বকুল এল।

'তুমি বলে গেলে ডিস্পেনসারিতে যাচ্ছ! যাওনি। কোথায় গিয়েছিলে?'

স্ত্রীর দিকে তাকাল গোপীজীবন। 'বললাম তো, একটা কাজ সেরে ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম।'

'কী কাজ!'

গোপীজীবন এবার আর কথা ঘোরাল না। লুকোতেও চাইল না। বলল, 'ভূতনাথের বাড়ি।'

বকুল অবাক হল। দেখল স্বামীকে। 'ভূতনাথের বাড়ি! কেন? সেখানে কী?'

গোপীজীবন চায়ের কাপ সরিয়ে রাখল। 'দেখতে গিয়েছিলাম।'

বকুল যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। কপাল চোখ কুঁচকে উঠল। 'দেখতে গিয়েছিলে! কী দেখতে গিয়েছিলে?'

গোপীজীবন উঠে গিয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজে নিল। সিগারেট ধরাল ধীরেসুস্থে। বলল, 'ভূতনাথ তার ঘরের চাবিটা রেখে গিয়েছিল কবুতরীর কাছেই। ফেলে গিয়েছিলও বলতে পার। সেই চাবি নিয়ে তার ঘরটা দেখতে গিয়েছিলাম।'

বকুলের ভুরুটা আরও কুচকে উঠল। চোখে সন্দেহ। 'দেখতে গিয়েছিলে! কী দেখতে গিয়েছিলে?'

গোপীজীবন কোনো কথা বলল না। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু যেন দেখছিল বাইরের দিকে তাকিয়ে।

বকুল দু পা এগিয়ে এল। 'কী হল? বলছ না যে!'

গোপীজীবন তবু কিছু বলল না।

বকুলের আর যেন সহ্য হচ্ছিল না। অসহিষ্ণু রুক্ষ গলায় বলল, 'বোবা হয়ে গেলে?' বলতে বলতে সে স্বামীর পেছনে এসে যেন কাঁধের কাছটায় খামচে ধরল।

গোপীজীবন ঘুরে দাঁড়াল। হাত সরিয়ে দিল স্ত্রীর। বলল, 'দেখতে গিয়েছিলাম ওর ঘরে যদি কিছু পাই!'

'পা-ই! কী পাবে?'

'না, ভাবলাম—ও এমনভাবে হঠাৎ আত্মহত্যা করল। যদি কিছু লিখে রেখে গিয়ে থাকে—বা কোনো কারণ যদি পাই—।'

'ও!···তা লেখাটেখা পেলে?'

'না।'

বকুল বলল, 'তবে'? এমনভাবে বলল যেন গোপীজীবনের নির্বুদ্ধিতাকে সে উপহাস করল।

গোপীজীবন হঠাৎ বলল, 'লেখা পাইনি। তব দুটো জিনিস পেয়েছি।'

'কী?'

হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে ঘরের কোণে রাখা ছোট টেবিলটা দেখাল গোপীজীবন। বলল, 'ওই যে ওখানে আছে। ওই যে—কাগজে মোড়া।'

'কী ওগুলো?'

'দেখো, গিয়ে দেখে নাও।'

বকুল এগিয়ে গেল ছোট-টেবিলের দিকে।

খবরের কাগজে আলগা করে মোড়া জিনিসটা কী হতে পারে—তার মাথায় আসছিল না।

কাগজ খুলতেই সে কেমন বিমূঢ় হতবাক। কী এগুলো ?

গোপীজীবন কোনো কথা বলছিল না।

বকুলই বলল, 'এসব কী ?'

'বাসী রুটির টুকরো। পিঁপড়ে খাওয়া।'

'এই নোংরা জিনিস এখানে এনেছ কেন ?'

'তোমাকে দেখাতে। আব একটা জিনিস অবশ্য আনিনি।'

'মানে ? আমাকে দেখাতে এনেছ ? কেন ? আমি কী দেখব ?'

'তোমার একটা ছেঁড়া চটিও ওর ঘরে রয়েছে দেখলাম। সেটা আনিনি।'

বকুল রেগে গিয়েছিল। বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ন্যাকামি করছ! ভূতনাথের ঘর কতকগুলো বাসী পচা ইঁদুরে খাওয়া রুটির টুকরো কুড়িয়ে এনে ন্যাকামি করছ! কী আছে ওর মধ্যে ?'

গোপীজীবন বলল, 'কী আছে তুমি বুঝে দেখো!'

বকুল হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। 'ফেলে দাও এসব। আমার শোবার ঘরে কোন সাহসে তুমি এই নোংরাগুলো এনে রেখেছ। ফেলে দাও।'

গোপীজীবন মাথা নাড়ল। বলল, 'না। তোমার হাতে আছে —তুমি ফেলে দাও। আমি নিজের হাতে বয়ে এনেছি, আমি কেন ফেলব !'

বকুলের কী হল কে জানে সে কাগজের মোড়াটা তুলে নিয়ে গোপীজীবনের মুখের দিকে ছুঁড়ে মারল। কাগজের মোড়া খুলে গেল। কয়েক টুকরো রুটি ছড়িয়ে পড়ল শোবার ঘরের মেঝেতে।

রাত যে কত কেউ জানে না। হয়ত মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে। বাইরের জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল বরাবর।

গোপীজীবন পাশ ফিরে শুয়েছিল।

বকুলও শুয়ে আছে, অন্যদিকে মুখ করে।

মাঝে মাঝে বকুল কেঁদে উঠছিল। মুখ চাপা দিয়ে। তবু তার কান্নার দমক, ফোঁপানি আটকাতে পারছিল না।

গোপীজীবন কিছু বলছিল না স্ত্রীকে। তাকে স্পর্শও করছিল না।

শেষ পর্যন্ত কখন যেন ধড়মড় করে উঠে বসল বকুল। গলা বোজা, কর্কশ ভাঙা। বলল, 'সেদিন আমি ওকে রুটি দিইনি। ও নিজে রান্নাঘরে গিয়ে বাতাসীর কাছ থেকে বাসী পোড়া রুটি আর গুড় চেয়ে নিয়ে খেয়েছিল। আমার দোষ কোথায়?—আর তুমি ছেঁড়া চটির কথা বলছ! আমি কি ইচ্ছে করে ওকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম! খাই খাই করে যা করছিল—যেন হ্যাংলা কুকুর। দূর দূর করলেও যাচ্ছিল না। রাগের মাথায় হাতের কাছে যা—ছুঁড়ে মেরেছিলাম। ···এতেই আমার দোষ হল?'

গোপীজীবন অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। বকুলের এই গভীর বেদনাকে যেন অনুভব করার চেষ্টা করছিল। বিছানায় আলো এসে পড়েনি চাঁদের, তবু আজ পূর্ণিমার আলোর আভা রয়েছে প্রায় ঘর জুড়ে। বকুলের মিহি ছায়া তার পায়ের পাশে ছড়ানো।

শেষ পর্যন্ত গোপীজীবন বলল, 'না, দোষ তোমার নয়। তুমি তো ওকে ভালোইবাসতে।' আর কোনো কথা আসছিল না মুখে। মনে মনে বলল, ভূতনাথেরও দোষ আছে। সংসারে অনেক রকম খিদে থাকে, বকুল। খিদের গ্লানিও থাকে। মানুষের থাকে। কুকুরের থাকে না। তুমি বোধ হয় সেটা বোঝনি। আর, কী জানি, হয়ত—হয়ত ও সেদিন জীবনে প্রথম সেই গ্লানি অনুভব করেছিল।

মাথা নাড়ছিল বকুল। 'না, আমি ওকে ভালোবাসতাম না। কেন বাসব....।' আর যেন পারছিল না বকুল, গলার মধ্যে কি

জীবনের সব কান্না চেপে রাখা যায় ? জোরে ফুঁপিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে সে কেঁদে উঠল।

গোপীজীবন চুপ করেই থাকল। বকুল শেষ পর্যন্ত একসময় থেমে যাবে। অনন্তকাল কেঁদে যাবার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। তাকে থেমে যেতে হয়। বকুলও থেমে যাবে। কবুতরীও একদিন এই শোক নিয়ে বসে থাকবে না।

তা হলে ?

তা হলেও কোথাও কিছু থেকে যায়। মনের মধ্যে। আঘাত, দুঃখ, কান্না, অনুতাপ। মাঝে মাঝে আপনমনে নিভৃতে তখন সেই পুরনো কান্না আবার ফিরে আসে। আসে, যায়। আবার আসে। আবার যায়।

গোপীজীবন কোনো কথা বলল না।

কস্তুরী

কস্তুরী বাড়ি ফিরল সন্ধ্যেবেলায়।

বাড়ি ফিরে গা ধুতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, বাইরের দরজায় টোকা শুনল। কলিং বেলটা খারাপ হয়ে আছে দিন দশ পনেরো হতে চলল। সারাবার গরজ নেই কারও। না কস্তুরীর না পঙ্কজের।

'কে?'

'আমি আরতি।'

'আসি।'

বাইরের শাড়িটা ছেড়ে ফেলেছিল কস্তুরী। গায়ের জামাও আধখোলা। গা ধুতেই যাচ্ছিল। ছাড়া শাড়িই আবার আলগোছে গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলতেই সামনে আরতি। হাতে সুটকেস।

আরতি বলল, দাদা এসেছেন দুপুরে। বাড়ি বন্ধ দেখে এই সুটকেসটা রেখে চলে গেলেন। বললেন, ঘুরে আসছেন।'

কস্তুরী বেশ অবাক হল। দাদা মানে পঙ্কজ। আরতি কখনো পঙ্কজদা বলে না—বলে দাদা। তা পঙ্কজ হুট করে ফিরে এল কেন? ওর তো আগামী রবিবার সকাল বা দুপুরে ফেরার কথা। আজ মাত্র বুধবার।

কস্তুরী বলল, 'সে কি! হঠাৎ ফিরে এল?' এমনভাবে বলল যেন পঙ্কজের ফিরে আসার কারণটা আরতিই জানে।

সুটকেস এগিয়ে দিল আরতি।

হাত বাড়িয়ে সুটকেস নিল কস্তুরী। 'কিছু বলে গেছে?'

'আমার সঙ্গে তো দেখা হয় নি!'

'তবে?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বুবি—আমার ননদ—ওই যে বেড়াতে এসেছে, তার কাছে সুটকেসটা দিয়ে বলে গেছেন; বলো পাশের দাদা এসেছিলেন। সদর বন্ধ দেখে চলে যাচ্ছেন। খানিকটা ঘুরে আসছেন। এটা রেখে দাও। ফিরে এসে নেব।'

'ও ! আর কিছু নয় ?'

'ননদ তো বলল না।'

'দুপুরে এসেছিল, এখন সন্ধে…'

'গিয়েছেন কোথাও, আসবেন।…আমি চলি বউদি। কর্তা সবেই ফিরলেন। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই।'

'আচ্ছা !'

কস্তুরী আবার সদর বন্ধ করল। সুটকেস নিয়ে ঘরে ফিরল। রেখে দিল সুটকেস।

আলগা করে জড়ানো শাড়িটা আবার খুলে ফেলল। জামা খুলল। কলকাতায় এখনও গরম চলছে। ভাদ্রমাসের গুমোট এই শেষ আশ্বিনেও। কী চড়া রোদ দুপুরে, আর দুপা হাঁটাহাঁটি করলে ঘামে যেন সর্বাঙ্গ জল হয়ে যায়। কস্তুরী মোটেই মোটাসোটা নয়, তার মেদ নেই, থাকলেও সামান্য বরং সে ছিপছিপে—এই সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর বয়েসে—তবু কেমন করে যে এত ঘাম হয় কে জানে। ধাত বোধ হয়।

বাথরুমেই চলে যাচ্ছিল কস্তুরী, হঠাৎ মনে হল—সে তো স্নানে চলল—এদিকে যদি পঙ্কজ ফিরে আসে। এসে সাড়া না পায় ভেতর থেকে তখন ?

দূর—এত সব ভাবাভাবির কী আছে ! বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই গা ধোবে কস্তুরী। বাড়ি তো ফাঁকা। সদরে টোকা পড়লে সে শুনতে পাবে। সাড়াও দিতে পারবে। 'আসছি, আমি বাথরুমে। একটু দাঁড়াও।' পঙ্কজকে দাঁড়াতে বলে সে আধভেজা গায়েও গিয়ে দরজা খুলে দিতে পারে।

তবে, ওই অবস্থাটা পঙ্কজের পছন্দ হয়ে যেতে পারে। ভব্যতার বালাই তার নেই। এত হালকা, ছেলেমানুষি স্বভাব, এমন জ্বালাতে পারে, মজাটজা করে যে—পঙ্কজকে থামানো যায় না। তাকে শোধরানোও গেল না।

'তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না।'

'পারবে না।'

'একটু তো শোধরাবে।'

'কেন! শোধরাব কেন? তুমি আমার বউ। আমার টিচার নও।'

'ওস্তাদি মেরো না। এক সময় তুমি আমাকে দিদি বলতে।'

'বউকে লোকে ভাইও বলে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—ভাই ছুটি। ওসব হল আদরের ব্যাপার। আদরে নিয়ম নাস্তি।'

'আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বড়।'

'জাস্ট এক বছর। তাতেই বা কী! ছেলেরা বয়েসে বড় হবে, মেয়েরা ছোট—তবেই তাদের প্রেম চলবে। বিয়ে হবে—এটা একটা প্রেজুডিস। সাহেব মেমসাহেবদের বেলায় এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম। অঙ্কের হিসেব করলে দেখা যায় সীতা রামের চেয়ে বয়েসে বড় ছিল।'

'থামো। বক্কেশ্বর! শুধু কথা!'

'কাজেও অপটু নই দিদি!'

কস্তুরী আর দাঁড়াল না, স্নানে চলে গেল।

বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই গা ধুয়ে নিচ্ছিল কস্তুরী। আজ যেন গুমোট আরও বেশি গিয়েছে। মাত্র তিন দিন পরেই পুজো। রবিবারেই ষষ্ঠী পড়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের এখন যা অবস্থা—লোকের আর ভিড়ের গুমোটেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয় আর পর দশ পনেরো দিন এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই—বাতাসটাই কেমন ভেপসে আছে।

স্নান করতে করতে কস্তুরীর খেয়াল হল, সাবানটা আর হাতে থাকছে না—বার বার পিছলে পড়ে যাচ্ছে। বেশ ছোট হয়ে গিয়েছে সাবানের টুকরো। না, এ সাবান চলবে না। একটা মেয়ে বাড়িতে এসে গছিয়ে গেল এক বাক্স, এমন করল দিদি দিদি যে—কস্তুরী না

নিয়ে পারল না। মেয়েটার ওপরই মায়া হল। কালো দেখতে, মস্ত এক বিনুনি মাথায়, মুখ ভরতি ঘাম, গলা ভিজে, পরনের শাড়ির পায়ের দিকটা ফেঁসে গেছে। সাবান, শ্যাম্পু, ডিটারজেণ্ট পাউডার নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু মায়া নয়, নিজের কথাও মনে পড়ল। কস্তুরীও একদিন রোদ জল ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ঘুরে বেড়িয়েছিল। সে সাবান ফেরি করত না বটে, তবে ফেরিঅলা সেজেই ঘুরে বেড়াত। অফিসে অফিসে বই গছাতে যেত কম্পানির হয়ে, খবর পেলে বাড়িতেও যেত।

মায়া করে একবার যা করেছে—বার বার করতে পারবে না। দু দিনেই যদি সাবানের এই অবস্থা হয়—হপ্তায় যে তিনটে করে সাবান লাগবে! দুজন মানুষের জন্যে হপ্তায় তিনটে করে সাবান! না, অত পয়সা কস্তুরীর নেই। তাছাড়া সাবানও ভাল নয়। স্নানের পর গা খসখস করে, খড়ি ওঠে। এমনিতেই কস্তুরীর একটু বেশি সাবান খরচ হয়। হাঁটিতে চলতে একটু কিছু করতেই তার ঘনঘন হাত ধোওয়া আছে সাবান দিয়ে। কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেয়। কখনও কখনও মুখটাও ধুয়ে ফেলে। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরলে দশ বার করে পা-ধোওয়া। জামা কাপড়ের বেলাতেই তাই। তিন দফা সায়া বদলানো আর কাচা, জামাও তাই, নিচের জামা গরমে বার দুই তো পালটাতেই হয়। রাত্রে সে নিচের জামা পরে না। কষ্ট হয় বুকে।

পঙ্কজ বলে, 'তোমার বাই! শুচি বাই! তুমি সাবান খাও।'

কস্তুরী নিজের এই বদ অভ্যাসটা বোঝে। কিন্তু শোধরাতে পারে না।

গা মোছা প্রায় শেষ।

যাক, পঙ্কজ এর মধ্যে ফেরে নি। এরপর যখনই ফিরুক কস্তুরীর ভয় পাবার কিছু নেই। মানে সে তখন সর্বাবৃত হয়ে থাকবে, পঙ্কজ তাকে জ্বালাতন করতে পারছে না।

ভেজা জিনিসগুলো প্লাস্টিকের বড় গামলায় জড় করে রেখে কস্তুরী বেরিয়ে এল। কাল সকালে কাচাকাচি করে নেবে। কাজের মেয়েটা আসবে, তারপর।

ঘরে এসে শাড়ি জামা গুছিয়ে পরে নিতে নিতে কস্তুরী ঘড়ি দেখল। দেওয়ালে ঝোলানো গোল ঘড়ি। সেকেণ্ডের কাঁটাটা যেন লাফ মেরে মেরে এগিয়ে যাচ্ছে। সাতটা বেজে গিয়েছে।

পঙ্কজ তো বেশ মানুষ! এল দুপুরে। পাশের ফ্ল্যাটে সুটকেস রেখে চলে গেল—ঘুরে আসছি বলে, তারপর সন্ধে সাতটা পর্যন্ত পাত্তা নেই। আশ্চর্য।

কিন্তু কস্তুরী বুঝতে পারছে না—পঙ্কজ হুট করে ফিরে এল কেন? তার কাজ রয়েছে চিত্তরঞ্জনে। তাদের কোম্পানির কাজ প্রায় ছদিনের টুর। মাত্র দু দিনেই ফিরে এল। শরীর খারাপ হয়েছে। তা যদি হবে—তবে সে বাড়ি ফিরে আবার এতক্ষণ আছে কোথায়? এমন যদি হয়—শরীর ঠিকই আছে, বাড়ি ফিরে ফ্ল্যাট বন্ধ দেখে সে সুটকেস রেখে অফিসেই চলে গেল? অফিসে গিয়ে হয়ত বোঝাচ্ছে, কেন সে ফিরে এল। আসা-যাওয়াই সার হল তার। অফিসের ব্যাপারে পঙ্কজ যে খুবই দায়িত্ববান—মানে অফিসকে ধ্যানজ্ঞান করে বসে থাকে—তা নয়। তবে সে ফাঁকিবাজ নয়, তার কাজটুকু সে যত্ন নিয়েই করে। রাগও আছে তার অফিসের ওপর। জামসেদপুরে গিয়ে অত ভাল একটা কাজ করে আসার পরও অফিস কলা দেখাল। প্রমোশান পাওয়া উচিত ছিল তার—ছোটখাট হলেও চলত। অন্তত দু একটা স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট এবারে দেওয়া উচিত ছিল। কোম্পানি দেয় নি। তাকে দিল না, অথচ ব্যানার্জিকে দিয়ে দিল। ব্যানার্জির সুতোয় মাঞ্জা আছে, বুঝলে কস্তুরী। ওর মেজকাকা নেতাগিরি করে। ট্রেড ইউনিয়ন।

কস্তুরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ পরিষ্কার করল, পাউডার ছড়িয়ে নিল গায়ে গলায় বুকে। মুখে পায় ঘষে নিল। পাখাটা

ছ ঘণ্টা সময় সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসেই যদি গিয়ে থাকে—অফিস তো রাতভর খোলা থাকে না যে সেখানে বসে আছে। বন্ধুবান্ধবের কাছে যদি গিয়ে থাকে—তা হলেও পঙ্কজের বোঝা দরকার—টুর থেকে অসময়ে ফিরে সুটকেসটা পাশের ফ্ল্যাটে জিম্মা করে দিয়ে সে চলে এসেছে—তার কি উচিত নয় অনেক আগেই বাড়ি ফিরে যাওয়া।

কস্তুরী ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বোধবুদ্ধি যাদের নেই, যারা বাউণ্ডুলেপনা করে ঘুরে বেড়ায়—তাদের ঘরসংসার করা কেন!

কোথায় গিয়ে মজে আছে পঙ্কজ। ওর সেই সিনেমা করা বন্ধুটার পাল্লায় পড়েনি তো! তার পাল্লায় পড়লে বিপদ। টেনে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দিয়েছে। পঙ্কজ অবশ্য মদটদ খায় না রোজ। কখনো সখনো বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়লে খায়। জিনিসটা তার সহ্য হয় না। একটু খেলেই নেশা হয়ে যায়। তারপর বাড়ি এসে কস্তুরীকে জ্বালিয়ে মারে। এই গান গাইছে, এই কবিতা আওড়াচ্ছে, নাটক করছে কস্তুরীকে বলছে—'এসো দিদি তোমার সঙ্গে হা ডুডু খেলি।' আবার নিজেই শীর্ষাসন করার চেষ্টা করে দেখাচ্ছে—সে মোটেই মাতাল হয়নি।

কস্তুরীর মনে হল না, পঙ্কজ তার সিনেমার বন্ধুর পাল্লায় পড়েছে। তার পাল্লায় পড়তে হলে ও পাড়ায় যেতে হবে। পঙ্কজ নিশ্চয় এসপ্ল্যানেড পাড়ায় যায়নি। তার অফিসও এসপ্ল্যানেড পাড়ায় নয়, থিয়েটার রোডেই অফিস।

তবে কি পঙ্কজ তার দীপাদির খোঁজ নিতে গেল?

দীপাদি—মানে দীপালি পঙ্কজের। এক পিসতুতো বোন। পিঠোপিঠি। খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, বন্ধু ছিল। দীপালির বিয়ে থায়ের পর সম্পর্ক ভাল থাকলেও দেখা-সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। ওরা এখন সিঁথিতে থাকে। দীপালি চাকরি করে ব্যাঙ্কে। তার

স্বামীও ব্যাঙ্কে। ব্যাংক আলাদা, দু জনের অফিসও আলাদা। মাঝে দীপালির খুব অসুখ করেছিল। বাচ্চা কাচ্চা পেটে এসে নষ্ট হয়ে যায়। তার জের চলছিল। পঙ্কজ কি তার দীপাদির খোঁজ নিতে গেল।

তাই বা কেমন করে যাবে! দীপাদি হয়ত এখন অফিসে। তা ছাড়া যেতে হলে খালি হাতে তো যাবে না। দীপাদির পুজোর শাড়ি কেনা রয়েছে বাড়িতে। সেটা নিয়ে যাবে।

কস্তুরী নিজে দীপালিকে তেমন পছন্দ করে না। খুব চালাক, স্বার্থপর, চালবাজ মেয়ে। দীপালিও পছন্দ করে না কস্তুরীকে। ও নাকি পঙ্কজকে বলেছিল, 'তুই ওই বুড়িটাকে নিয়ে করবি কিরে? ওযে তোর মাসির বয়েসী। আর ওই তো দেখতে। কালো, ঢেঙা, হাড় সর্বস্ব। ধন্যি তোর পছন্দ। তুই আর মেয়ে পেলি না। তোকে বেশ বশ করেছে তো! কী খাইয়েছে রে তোকে?'

পঙ্কজ নিজেই হাসতে হাসতে কথাটা বলেছিল কস্তুরীকে। 'মেয়েরা ভীষণ জেলাস হয় বুঝলে কিনা! দীপাদির হিংসে হচ্ছে।'

'কেন?'

'হয়।'

'তুমি ওর ইনটিমেট ছিলে তাই বুঝি?'

'খানিকটা তো তাই।'

'বাকিটা?'

'ও হয়ত ভেবেছিল— আমার বিয়েতে খানিকটা মোড়লি করবে। মেয়েদের ব্যাপার!'

'তা হলে সত্যি কথাটা শুনবে। তোমার দীপাদি মোড়লি করতে চাক না চাক।'

'ধ্যুৎ, ছেড়ে দাও। ওর চাওয়া না চাওয়ায় আমার কী যায় আসে! আমি তো তোমাকেই চেয়েছিলাম।'

পঙ্কজ ঠিক বলছে, না, কস্তুরীর মন ভোলাচ্ছে—তা নিয়ে সে আর কিছু বলেনি।

চা শেষ করতে করতে আটটাও বেজে গেল।

কস্তুরী অন্যমনস্কভাবে ঘরের চার পাশে তাকাচ্ছিল। পঙ্কজ তাকে তো বড় মুশকিলে ফেলল। রেগে উঠেছিল কস্তুরী। পঙ্কজের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি সে করে না। কখনো কখনো কথা কাটাকাটি, রাগ, অভিমান—না হয় এমন নয়, কিন্তু সে তো সাংসারিক ব্যাপার; দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়!

কাপ হাতে উঠতে যাচ্ছিল কস্তুরী, হঠাৎ—একেবারে হঠাৎই তার নজর পড়ে গেল সুটকেশটার ওপর। আরতি সুটকেসটা হাতে তুলে দেবার পর কস্তুরী সোজা ঘরে এসে আলমারির পাশে নামিয়ে রেখেছিল। তখন তার ভাল করে দেখার কথা মনে হয়নি। দরকারও বোধ করেনি। সবেই বাড়ি ফিরেছে, জামা-কাপড় ছাড়ছে, নেয়ে ঘেমে একসা, ওদিকে বাইরে থেকে ডাকল আরতি, কোনো রকমে শাড়িটা গায়ে ঝুলিয়ে সদরে যেতেই, দরজা খোলামাত্র সুটকেসটা দিয়ে দিল হাতে, দিয়ে পঙ্কজের কথা বলল। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আচমকা, কস্তুরী খানিকটা অবাক হলেও—একেবারে অস্বাভাবিক ঘটনা কিছু নয় বলে—সুটকেসটা হাতে নিয়ে সে ঘরে এসে একপাশে রেখে দিল। তারপর পঙ্কজের কথা ভাবতে ভাবতে শাড়ি জামা ছেড়ে বাথরুমে চলে গেল। বাথরুম থেকে ফিরে এসেও সে এই ঘরে ছিল, সাজগোজ করেছে, পঙ্কজের কথা ভেবেছে। সুটকেসের দিকে তার নজরই পড়েনি। এতক্ষণই বা কোথায় নজর পড়েছিল। এইমাত্র পড়ল।

কস্তুরী তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

কোমর নুইয়ে সুটকেসটা দেখল।

এ কার সুটকেস? কার এটা?

পঙ্কজের সুটকেস নয়। না হবারই কথা। এ-বাড়িতে সুটকেস কম। একটা পঙ্কজের, অন্যটা কস্তুরীর। আর একটা যা আছে তাকে সুটকেস বলা যায় না, বলা উচিত বাস্কেট। বিয়ের সময় ওরা নিজেরা এক জোড়া ভাল সুটকেস কিনেছিল। প্রায় একই রকম রঙ। পঙ্কজের সুটকেসটা ছিল ছোট, কস্তুরীরটা সামান্য বড়।

আগে পঙ্কজ তার সুটকেস নিয়েই বাইরে যেত। ছোট বলে অসুবিধে হচ্ছিল, তা ছাড়া পঙ্কজের সুটকেসের 'লক্‌টা' গোলমাল করছিল বলে হালে বার দুই পঙ্কজ বাইরে যাবার সময় কস্তুরীর সুটকেসটাই নিয়ে যাচ্ছিল। এবারও নিয়েছিল। কিন্তু...

কস্তুরী মাটিতে বসে পড়ল। দেখল সুটকেসটা।

কী কাণ্ড! এ-সুটকেস তাদের নয়। কস্তুরীর নয়।... সঙ্গে সঙ্গে কস্তুরী ঘরের বাঁ দিকে তাকাল। কাঠের এক লম্বাটে ছোট বেঞ্চির ওপর একটা ট্রাংক আর পঙ্কজের নিজের সুটকেস গোছগাছ করে রাখা আছে।

কেমন অবিশ্বাস্য চোখ করে কস্তুরী তার হাতের কাছের সুট-কেসটা দেখতে লাগল। আশ্চর্য তো! ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি?

না, এ সুটকেস কস্তুরীর নয়। কস্তুরী নিজের হাতে পঙ্কজের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিল সুটকেসে। তা ছাড়া কস্তুরী তার নিজের জিনিস। চিনবে না? তখন তার খেয়াল হয়নি, চোখেও পড়েনি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে—এ অন্য সুটকেস। কস্তুরীর সুটকেসের কাছাকাছি রঙ। এটা একটু বাদামী। কস্তুরীরটা ছিল সামান্য ধুসর। মাপ হয়ত একই।

সুটকেসটা টেনে নিয়ে ভাল করে দেখল কস্তুরী। গা দেখল। চাবি দেখল। কোথাও কিছু লেখা আছে কিনা দেখল। না, কস্তুরীর সুটকেস—পঙ্কজ যেটা নিয়ে গিয়েছিল—এ সুটকেস সেটা নয়।

তা হলে?

দুই

আরতি দরজা খুলল। 'বউদি!'

'তুমি খুব ব্যস্ত?'

'না। কী হয়েছে'?

'শোন, মানে—একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তুমি তখন যে সুটকেসটা দিলে—বললে, তোমার দাদা এসে রেখে গিয়েছেন আমাদের বাড়ি তালাবন্ধ দেখে' !

'হ্যা।'

'কিন্তু সুটকেসটা তো তোমার দাদার নয়। আমাদের নয়।'

আরতি অবাক। 'সে কী?'

'তখন তাড়াতাড়িতে আমি লক্ষ্য করিনি। এখন দেখছি—।'

'দাদা ফেরেননি?'

'না।'

আরতি বুঝতে পারল না, কী বলবে! তারপর ইতস্তত করে বলল, 'আমি তো সুটকেসটা নিইনি, বউদি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝ দুপুর। আমার ছোট ননদ নিয়েছে।'

'তোমার ননদকে একবার ডাকবে?'

'আপনি ভেতরে আসুন না'।

'সদর খোলা। এখান থেকেই দুটো কথা জিজ্ঞেস করে নিই।'

আরতি তার ননদকে ডাকল।

টেলিভিসন দেখছিল ননদ। ডাকাডাকিতে বাইরে এল। মন পড়ে আছে টেলিভিসনে।

'বুবি, তোমায় যিনি সুটকেস দিয়ে গেলেন—তিনি কী বলেছিলেন?' আরতি বলল।

বুবির বয়েস তেরো চোদ্দ। কিশোরী মেয়ে বহরমপুর থেকে বেড়াতে এসেছে। পুজো দেখবে কলকাতার।

'সুটকেসটা রেখে দিতে বললেন ভেতরে। পাশের বাড়ি…'

'কেমন দেখতে'?

'এমনি দেখতে'।

'ফরসা না কালো?' কস্তুরী জিজ্ঞেস করল।

বুবি একটু ভাবল। 'ফরসা।…না ফরসা নয়—ময়লা'।

'চোখে চশমা ছিল'?

'না।'

কস্তুরী বুঝতে পারল, প্রশ্নটা অর্থহীন। পঙ্কজ চশমা পরে না। চশমা তার আছে। পড়াশোনার সময় পরে, তাও মাঝে মাঝে। নাম বলছেন না'?

না। বললেন, বলো পাশের বাড়ির দাদা।'

'কেমন দেখতে? মুখটা কেমন!'

বুবি একটু ভাবল। ভাল দেখতে।'

'লম্বা মতন মুখ, চুল কোঁকড়ানো? ছিপছিপে চেহারা?'

বুবি খেয়াল করবার চেষ্টা করল। তারপর আরতিকে বলল, এখানটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার হয়ে থাকে দুপুরে বেলা। উনি একটু দাঁড়িয়েই চলে গেলেন। গায়ে শার্ট ছিল। প্যান্ট।'

'মুখটা মনে নেই।'

'লম্বাই হবে।'

'আর কিছু মনে পড়ে না?'

'না, উনি খুব সুন্দর করে হেসে হেসে কথা বলছিলেন।'

বুবিকে দাঁড় করিয়ে রাখার আর কোনো মানে হয় না।

আরতি বলল, 'দাদাই মনে হচ্ছে।'

কস্তুরী বুঝতে পারল না। বুবি ঠিক করে কিছুই বলতে পারছে না। কবে এসেছে বুবি? 'ও কবে যেন এসেছে?'

আরতি বলল, 'গত পরশু।'

পঙ্কজ বাড়ি ছেড়েছে পরশুর আগের দিন। মানে তিন দিন হল। বুবি পঙ্কজকে দেখেনি। মেয়েটা বহরমপুর থেকে এসেছে সদ্য। এই ফ্ল্যাট বাড়ির কাউকেই চেনে না। এখানকার ধরন-ধারণের সঙ্গে রপ্ত নয়। বোধহয় তেমন চালাক চতুরও নয় যে খুঁটিয়ে কিছু দেখবে, জিজ্ঞেস করবে।

আরতি বুবিকে চলে যেতে বলল। বুবি চলে গেল।

আরতি বলল, 'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! দাদা ছাড়া কে আসবে?'

'না, হ্যাঁ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার দাদা যদি দুপুরে এসে থাকে—সে তা অনেকক্ষণ হল। সুটকেস রেখে আসছি বলে চলে গেল। পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যে আর এল না। কোথায় গেল? আর অন্য লোকের সুটকেসই বা সে আনবে কেন?'

আরতি নিজেও ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। বলল, 'আপনি ঘরে যান, আমি ওকে বলছি। খোঁজ করবে।'

'তোমার ননদ কিছু গোলমাল করেছে, আরতি। হয়ত অন্য কেউ এসেছিল। অন্য কোনো ফ্ল্যাটে···'

'আপনি ঘরে যান। আমি দেখছি।'

কস্তুরী ফিরে এল।

বুবি নিশ্চয় কোনো ভুল করেছে। আরতিরও ভুল হচ্ছে। এই সুটকেস অন্য কারও, হয়ত ওপর নিচের কোনো ফ্ল্যাটের।

সামান্য পরেই তারাপদ এল সঙ্গে আরতি।

তারাপদ রাইটার্সে কাজ করে। মিশুকে লোক। পাড়ায় তার জানা শোনা অনেক। বলল, 'কী হয়েছে বউদি?'

আরতি বলল, 'বললাম তো তোমাকে।'

'আরে দাঁড়াও, বউদির মুখ থেকে শুনি।'

কস্তুরী বলল আবার।

তারাপদ শুনল মন দিয়ে। তারপর বলল, 'আমি আমাদের বিল্ডিংটায় খোঁজ নিচ্ছি। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বিল্ডিংটায় কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। আমাদের কম্পাউন্ডের নিশ্চয় কারও চোখে পড়বে। পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। আপনি ভাববেন না।'

'কিন্তু সুটকেসটা তো আমাদের নয়।'

'আর ইউ সিওর।'

'বাঃ। তুমি যে কী বলো?' আরতি বলল।

'না-ইয়ে। বদলে টদলে যায়নি তো। ব্যাগ সুটকেস এগুলো প্রায় বদলে যায়। যাক গে আমি দেখছি।'

তারাপদ খোঁজ খবর করতে বেরিয়ে গেল।

আরতি বলল, 'ওই সুটকেসটা না?'

'হ্যাঁ।'

'একবার খুলে দেখুন না। দাদার সুটকেস হলে—দাদার জিনিসপত্রই থাকবে।'

'চাবি কোথায় পাব?'

'ডুপ্লিকেট চাবি নেই?'

'ডুপ্লিকেট। ছিল তো—কোথায় রেখেছি তা কি মনে আছে।'

'খুঁজে দেখুন না।'

কস্তুরী দাঁড়িয়ে থাকল। কোথায় এখন ডুপ্লিকেট চাবি খুঁজে পাবে! আলমারি, লকার, ড্রয়ার, অন্য সুটকেসটার তলায় কোথায় পড়ে আছে কে জানে।

আরতি বলল, 'আপনি দেখুন খুঁজে আমি আসছি।'

তারাপদ ফিরল আধ ঘণ্টা টাক পরে।

ফিরে এসে বলল, 'হরি ঘোষের গোয়াল যেন! এই সব ফ্ল্যাট বাড়ি হাউসিং-এর এই এক মস্ত দোষ বউদি। কেউ কারুর খোঁজ রাখে না।' তারাপদ হতাশ, বিরক্ত। হাতে একটা সিগারেট।

'বারোয়ারি ব্যাপার হলে যা হয়। লোক আসছে যাচ্ছে, কে কোথায় ঢুকে পড়ছে। চলে যাচ্ছে—কেউ দেখে না। তারপর আবার দুপুর বেলা। বাবুরা অফিসে, গিন্নিরা ঘুম মারছে। পুজো প্যাণ্ডেলের লোকগুলোও ছিল না। টিফিন করতে গিয়েছিল। কেউ কিছু বলতে পারে না। যা বলে সবই ভাসা ভাসা।… আপনি এক কাজ করুন। আমায় দু একটা নাম ঠিকানা দিন গুপ্তদার বন্ধুদের। আমি ফোন করে খবর নিয়ে আসি।'

কথাটা কস্তুরীরও মনে এসেছিল। কিন্তু কাকে ফোন করবে। ক'জনের ফোন আছে তাও সে জানে না। ঠিকানাগুলোও তো ভাল করে জানা নেই। সুবোধবাবু থাকেন ভবানীপুরে, দ্বিজেন মিত্র হাওড়া, বলাই পাল শ্যামবাজার-বাগবাজার, করুণা…করুণা মানিকতলা। করুণার কথাই মনে পড়ল কস্তুরীর। তার ফোন নম্বরও লেখা আছে। অন্যদের মধ্যে—থাক অন্যরা থাক।

কস্তুরী বলল, 'এক জায়গায় ফোন করা যেতে পারে।'

'বলুন। ফোন করে খবর নিচ্ছি।'

সামান্য ইতস্তত করল কস্তুরী। 'আমি যাব?'

'বেশ তো, চলুন না।'

কস্তুরী তাড়াতাড়ি করে টেবিলের ওপর থেকে একটা পকেট বই উঠিয়ে পাতা ঘাটল। ফোন নম্বর লিখে নিল কাগজে। তাড়াহুড়োয় যদি ভুল হয়ে যায়—লিখে নেওয়াই ভাল। 'চলুন।'

ওষুধের দোকান থেকেই ফোন ধরল তারাপদ। পাওয়া গেল করুণাকে। 'নিন, পাওয়া গেছে।'

কস্তুরী ফোন নিল। 'আমি কস্তুরী বলছি।'

ওপারে করুণার গলা। 'বলুন বউদি। কী ব্যাপার।'

'একটা মুশকিল হয়েছে। মানে, আমি বাড়ি ছিলাম না। দুপুরে আপনার বন্ধু ফিরে এসেছে। ফিরে এসে পাশের ফ্ল্যাটে

স্যুটকেস রেখে চলে গেছে ঘুরে আসছি বলে। তারপর এই ছ'সাত ঘণ্টা হতে চলল—ওর পাত্তা নেই। আপনি কি জানেন, ট্যুর থেকে হঠাৎ ফিরে এল কেন।'

করুণা বলল, আমি জানি না। আজ আমি অফিসেও যাইনি বউদি। স্টমাক আপ সেট্। তবে পঙ্কজের ফেরার কথা এখন নয়।'

'তা হলে?'

'অবশ্য একটা ফ্যাক্টার আছে। যে কাজে ও গিয়েছে যদি সেটা এখন না হয়—মিছেমিছি বসে থাকবে কেন? আমার মনে হয়, পুজো সামনে—যাদের নিয়ে কাজ তারা যদি ছুটিটুটি নিয়ে পালায়। কিংবা ধরুন, এ সময় হাত লাগাতে না চায়—তবে কাজটাই হবে না। কাজ না হলে বসে থেকে কী করবে। পুজোর একেবারে মুখে অফিস থেকে ওকে পাঠানোই উচিত হয়নি।'

কস্তুরী ভাবল। 'আপনাদের অফিসে কোনো খবর নেই?'

'আমি জানি না। কাল অফিসে গিয়ে খোঁজ করব।'

দুশ্চিন্তার গলায় কস্তুরী বলল, 'আমি কী করব বলুন তো?'

করুণা কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, 'কী আর করবেন! এখন আর কত রাত--ন'টা বোধহয়। ওয়েট করুন। হয়ত কোথাও গিয়ে আটকে গিয়েছে।'

'বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

করুণা চুপ। বার কয়েক শুকনো কাশি কাশল।

কস্তুরী বলল। 'কোনো বিপদ ঘটল না তো?'

'আরে না! পঙ্কজ যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তেমন হলে খবর আসত আপনার কাছে। ও নিয়ে ভাববেন না। দেখুন না আরও এক আধ ঘণ্টা।' করুণার গলা শুনে মনে হল যে সান্ত্বনা দিচ্ছে কস্তুরীকে।

ফোন রেখে দেবে কি দেবে না করে কস্তুরী বলল, 'শুনুন।

একটা ব্যাপার হয়েছে। যে সুটকেসটা আমি পেলাম সেটা আপনার বন্ধুর নয়। অথচ একজন আমার পাশের ফ্ল্যাটে এসে দিয়ে গেছে। বলে গেছে ঘুরে আসছি। আপনার বন্ধুর···'

কথা থামিয়ে করুণা বলল, 'অন্য লোকের সুটকেস ? বলেন কী! স্ট্রেঞ্জ! হাউ ইট ইজ পসিবল! পঙ্কজই তো দিয়ে গেছে।'

'তাই তো জানতাম। এখন সন্দেহ হচ্ছে!'

সামান্য চুপচাপ। পরে করুণা বলল, 'অদল-বদল হয়ে যায়নি তো? আমার একবার হয়েছিল। দিল্লী যাচ্ছিলাম। তা আপনি ভাববেন না। কাল আমি অফিসে গিয়ে সব খোঁজ করছি। দুপুরের আগেই জানতে পারবেন আপনি···। ঘাবড়াবেন না। কলকাতা তো পাঞ্জাব নয় যে সুটকেসের মধ্যে টাইম বোমা থাকবে।'

শেষ পর্যন্ত ফোন রেখে দিল কস্তুরী।

ফেরার পথে তারাপদ বলল, বউদি, আপনি ঘাবড়াবেন না। একটা গোলমাল হয়েছে। আমার তো মনে হয়, সুটকেসটা বদলা বদলি হয়ে গেছে। ভুল করে কেউ যদি আপনার কাছে দিয়ে গিয়ে যাবে, সে নিজেই আসবে!'

কস্তুরী কোনো জবাব দিল না।

তারাপদ সাহস জোগাতে লাগল। 'ভয়ের কিছু নেই। সুটকেস যদি আপনাদের না হয়—তাহলে পঙ্কজবাবু হয়ত ফিরেই আসেননি। অন্য কেউ এসেছিল।'

'অন্য কেউ কেন আসবে!'

তারাপদ থতমত খেয়ে গেল। ভাবল। 'কী জানি···! সে যাই হোক, এখন কিছু করার নেই। আপনি অপেক্ষা করুন। রাতও বেশি হয়নি। দেখুন না···। আর আমরা তো আছি।'

তিন

দশ থেকে এগারো হল; কাঁটা সাড়ে এগারোটার দিকে সরে যাচ্ছে।

কস্তুরী বার দুই জল খেয়েছে। মাথা ধরে গিয়েছিল। এস-প্রিন ট্যাবলেট না খেলেই নয়। এক টুকরো রুটি আর এক কাপ দুধ মুখে দিয়ে ট্যাবলেট দুটো খেয়ে ফেলল।

এখন কস্তুরীর মনে হচ্ছে, পঙ্কজ আসেনি। ব্যাপারটা নিশ্চয় কোনো ভুল থেকে হয়ে থাকবে। বুবি ভুল করেছে। বুবি পঙ্কজকে চেনে না। পঙ্কজ চলে যাবার পর সে আরতির কাছে এসেছে। মানে পঙ্কজ গিয়েছে রবিবার আর বুবি এসেছে সোমবার। মফস্বলের মেয়ে। চালাক-চতুরও নয়। কলকাতার এই সব মৌচাকের মতন ফ্ল্যাট বাড়ির হালচালও বোঝে না। সাদা-সিধে সরল মেয়ে। বয়েস কম। মাঝদুপুরে এক ভদ্রলোক এসে যদি বলে, আমি পাশের ফ্ল্যাটে থাকি, ফ্ল্যাট বন্ধ, এই সুটকেসটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে রেখে দাও, আমি ঘুরে আসছি। তাহলে সে সরল বিশ্বাসে সুটকেসটা নিয়ে নিতেই পারে। বুবির দোষ নেই।

আচ্ছা ধরা যাক, বুবি না এসে যদি আরতি আসত, তবে?

তবে কী হত কস্তুরী জানে না। পঙ্কজ হলে কোনো কথাই থাকত না। আরতির হাতে সুটকেস গছিয়ে দিয়ে চলে যেত। আর কস্তুরীও নিশ্চিত হত, পঙ্কজই এসেছিল।

আর যদি পঙ্কজ না হত—তাহলে হয়ত সে পঙ্কজের নাম করে বলে যেত—'পাশের ফ্ল্যাট বন্ধ। এটা পঙ্কজবাবুর সুটকেস। দয়া করে তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে দেবেন। তিনি খানিকটা পরে ফিরছেন।'

আরতি সুটকেস নিত। সে জানে দাদা টুরে গিয়েছে কলকাতায়,

নেই। টুর থেকেই দাদা ফিরে এল। নিজে খানিকটা পরে আসছে, লোক দিয়ে তার জিনিসটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। এসবই খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু আরতি কি বুঝত, সুটকেসটা পঙ্কজের নয়। বুঝত না। অন্যের জিনিস সে কেমন করে বুঝবে! কস্তুরীই কি খেয়াল করেছিল প্রথমে? সে তো নিজেদের বলেই ঘরে নিয়ে এসেছিল। পরেই না তার চোখে পড়ল!

কস্তুরী ততক্ষণে এক গোছা চাবি নিয়ে বসে পড়ছে। আলমারি হাতড়ে, লকার হাতড়ে, ড্রয়ার আর ট্র্যাংক ঘেঁটে যেখানে যত চাবি পেয়েছিল—পুরনো অব্যবহার্য থেকে নতুন—যা এখন ব্যবহার করে—সব নিয়ে বসে পড়েছিল বিছানায়। বিছানার ওপরই সে তুলে নিয়েছে সুটকেসটা। চাবি খোলার চেষ্টা করছে।

সুটকেসটা খুলে না দেখা পর্যন্ত কস্তুরী আর স্থির হতে পারছে না। কী আছে ওর মধ্যে? পঙ্কজের প্যাণ্ট শার্ট পাজামা পাঞ্জাবি আণ্ডার উইআর? পঙ্কজের রুমাল, সেভিং সেট? পঙ্কজের টুথ ব্রাশ পেস্ট সেভিং লেদার?··· যদি থাকে সব পঙ্কজের তবে ধরে নিতে হবে—সুটকেসটা অন্য কারো, পঙ্কজ যে-কোনো কারণেই হোক নিজেরটা নষ্ট করেছে। করে অন্য কারো কাছ থেকে ধার নিয়েছে এই সুটকেসটা আর যদি সুটকেসের মধ্যে পঙ্কজের কিছু পাওয়া না যায়—তবে বুঝতে হবে, ভুল করে কেউ অন্যের জিনিস এখানে রেখে গেছে।

বারোটা, সোয়া বারোটা বেজে গেল। পাখা চলছে হুহু করে। এত বড় ফ্ল্যাটের সব নিস্তব্ধ। হয়ত কোথাও বাতিও জ্বলছে না; অন্ধকার।

কস্তুরীর কেমন রোখ চেপে গিয়েছিল। একটা চাবিও লাগবে না। ডুপ্লিকেট পাওয়া গেল কিন্তু লাগল না-এ তো অন্য সুটকেস।

ঘামছিল কস্তুরী। উত্তেজনার ঘাম। রোখের আর জেদের জন্যেই তার মুখ শক্ত, চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। গা জ্বালা করছে। কপাল কান গরম। এই দুটো চাবি ছড়ানো রয়েছে তার সামনে। একটাও তো লাগছে না।

তা হলে?

কস্তুরীর কেমন হতাশা লাগছিল। ক্রমশই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। স্যুটকেসটা যেন নির্বিকার ভাবে তার সামনে পড়ে আছে। তামাশা দেখছে নাকি?

আবার চেষ্টা করল কস্তুরী। হল না।

ড্রেসিং টেবিল থেকে কাঁটা আনল সোন্না আনল, নেল কাটার। একটা ছোট স্ক্রুডাইভারও যোগাড় করে নিয়ে এল। একটার পর একটা ঢোকাতে লাগল চাবির বদলে। জোর করে করে ঘোরাবার চেষ্টা করল। কাঁটা বেঁকে গেল। নেল কাটারের সঙ্গে যে বেকানো আঁকশি তোলা ছুরিটা দিল-সেটারও মুখ নষ্ট হয়ে গেল। না-স্যুটকেস খুলল না। খুলবে না। ধৈর্য্য শেষ হয়ে আসছিল কস্তুরীর। মাথা দপদপ করছে ঘৃণা হচ্ছিল তার। একটা সুটকেস— নিত্যন্তই স্থূল এই পদার্থ, তবু ওই বস্তুটাই যেন তাকে নিয়ে খেলা করছে। উপহাস করছে। কি মনে করে কস্তুরী দু হাতে ঠেলে দিল জিনিসটা। সুটকেসের মুখটা ঘুরে গেল।

আঁচলে মুখ মুছল কস্তুরী। কানের তলায় কী যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘাড় ব্যথা করছিল। না, এই সুটকেস নিয়ে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। খানিকটা যেন ক্ষিপ্ত হয়েই সে সুটকেসটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। শব্দ হল। মেঝেতে ছিটকে পড়ল সুটকেস। পড়ে উলটে গেল। চাবিগুলোও হাতের ঝাপটায় বিছানা থেকে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে দিতে উঠে পড়ল কস্তুরী মনে মনে বিড় বিড় করে বলছিল কিছু।

বিছানার ঢাকাটা তুলে পরিষ্কার করে নিল; অনেক রাত হয়ে গেল।

বাথরুম থেকে ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে সাবানে হাত পরিষ্কার করে খানিকটা ভিজে ভিজে অবস্থায় ঘরে ফিরল কস্তুরী। জল খেল আঁচলে মুখ মুছল। পাখা চলছে, বাতাসও আসছে জানালা দিয়ে। ঘর এখন খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে, মাঝরাত পেরিয়ে গেল।

বাতি নেভাবার সময় সুটকেসটা দেখল একবার। উল্টে পড়ে আছে। থাকুক।

বিছানায় এসে শোবার সময় শাড়ি একেবারে আলগা করে, জামা খুলে ফেলে শুয়ে পড়ল কস্তুরী।

শুয়ে পড়ে একবার তার মনে হল, ও কি ভয় পেয়েছে? কিন্তু ভয় পেয়ে যাবার মতন কিছু কি আছে? সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল। কার ভুল, কেন ভুল—এসব সে জানে না। তবে ভুল। সংসারে অহরহ এমন ভুল হচ্ছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই সুটকেসটা নিয়ে পঙ্কজ যায়নি। এটা তার নয়। কাজেই আর যাই হোক পঙ্কজ ফিরে আসেনি। যে আসেনি-তার এখানে এসে আপদ বিপদ হবার কোনো কারণ নেই। আর এমন যদি হত—চিত্তরঞ্জনেই তার কিছু হয়েছে, তবে নির্ঘাত অফিসে খবর চলে আসত দুপুরের আগেই। তা হলে কস্তুরীও জানতে পারত। অফিস থেকে দফায় দফায় লোক আসত। করুণাও জেনে যেত।

কস্তুরী নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। সে কচি খুকি নয়, তার ধাতও নরম নয়। জীবনে সে অনেক বড় বড় ধাক্কা সয়েছে কতবার-সেই সব ধাক্কা যদি সে সামলে নিতে পেরে থাকে-তবে এই ব্যাপার নিয়ে উতলা হবার কী আছে।

গায়ের আঁচলটা সরিয়ে আরও যেন নির্ভার হয়ে কস্তুরী চোখের পাতা বুজল। বুজে সে মনে মনে আকাশের তারা ভাববার চেষ্টা করল-সপ্তর্ষি মণ্ডল, কালপুরুষ···। কে যেন শিখিয়ে দিয়েছিল একেবারে অলস এলোমেলো হয়ে শুয়ে আকাশের তারা ভাববার চেষ্টা করলে নিজের থেকেই ঘুম এসে যাবে। কস্তুরী নিজে চেষ্টা

করে দেখছে। এই ধরনের মনস্থির করার খেলায় বেশ উপকার পাওয়া যায়।

কস্তুরী কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

চার

ঘুমের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

'তুমি।'

'ঘুমিয়ে পড়লে!'

'অদ্ভুত! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি...'

'অবাক হবার কিছু নেই।'

কস্তুরী মানুষটার গলায় হালকা তামাশার ভাব বুঝতে পারছিল। কথা বলতে বলতে লোকটা পাশে বসল। বসে হাত বাড়িয়ে কস্তুরীর গলার কাছে কাঁধে যেন টোকা মারল। মজার মুখ করে দেখছিল, তারপর ঝুঁকে পড়ল।

কস্তুরীর রাগ হচ্ছিল। 'তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছিলে?'

'কই! তামাশার কী দেখলে!'

'কী! করলে তামাশা আবার বলছ তামাশার কী দেখলে! তোমার লজ্জা করে না। সেই বিকেল থেকে আমাকে ভাবিয়ে মারলে!'

'ওই একই হল।'

মানুষটা প্রায় কস্তুরীর গায়ে গা ঠেকিয়ে ঝুঁকে রয়েছে। কাঁধ থেকে আলগা শাড়ি সরিয়ে দিয়েছে কস্তুরীর। হালকা করে হাত বোলাচ্ছিল গলায়, গলার পাশে, মুখে।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' কস্তুরী জিজ্ঞেস করল।

'কোথাও নয়, আশে পাশেই ছিলাম।'

'আশেপাশে? এর পর বলবে পাশের ঘরটায়,' রাগে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিল মানুষটার। 'সরো।'

'পাশের ঘরেও থাকতে পারি।' আবার সেই তামাশা।

কস্তুরীর মাথা গরম হয়ে গেল। 'বাজে কথা বলো না। একটা মানুষকে সন্ধে থেকে ভুগিয়ে দুর্ভাবনায় আধমরা করে এখনও তোমার ঠাট্টা রসিকতা করতে আটকাচ্ছে না!'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'মরতে। যাও জ্বালিয়ো না।'

মানুষটা কিন্তু জ্বালাচ্ছিল। এবার তার হাত কস্তুরীর বুকের ওপর। 'এত রেগে যাচ্ছ কেন!'

তুমি মাঝ দুপুরে মরতে বেরিয়ে যাবে! কোথায় গিয়েছিলে?'

'অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম।'

'শুনি?'

'আমার পুরনো অফিসে। সেখান থেকে ডোভার লেনে। ফিরে এসে রক্ষীবাবুর কাছে। সেখান থেকে চোখের ডাক্তার···।'

'রক্ষীবাবু কী বলল?'

'কিছু না।'

'শুধু শুধু তোমার মুখ দেখল!'

'অসভ্যতা করো না···কী হচ্ছে, হাত সরাও। আমারটা মানুষের শরীর···'

'শরীরটাই দেখছি।'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে? দীপার কাছে?'

'না।'

'মিথ্যে বলছ!'

'মিথ্যে তুমিও বলো।'

'কেন আমায় চটাচ্ছ'··· আমি তোমার ব্যাপার-স্যাপার সত্যিই

বুঝতে পারছি না। গেলে চিত্তরঞ্জনে। ফেরার কথা আসছে রবিবার। সুট করে বুধবারেই ফিরে এলে। এসে একটা সুটকেস রেখে চলে গেলে। ওটা কার সুটকেস?'

'কেন, তোমার।'

'আমার নয়।'

'তোমার ছাড়া কার হবে।'

কস্তুরী যেন রাগের মাথায় উঠে বসতে যাচ্ছিল। পারল না। তার বুক পেটের ওপর হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে ও। ভার আর চাপ লাগছিল কস্তুরীর। আমার নয়। আমার সুটকেস আমি চিনব না! চিত্তরঞ্জনে গিয়ে খারাপ নেশা ভাঙ করে পড়েছিলে নাকি? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তোমার!'

মানুষটা কস্তুরীর বুকের নিচে মুখ ঘষে ছেলেমানুষি খেলা খেলছিল। মুখ দিয়ে শব্দ বার করল। সুড়সুড়ি দিল। তারপর বলল চিত্তরঞ্জনে গিয়ে আমি একদিন একটু হুইস্কি খেয়েছিলাম। শর্মা খাওয়াল। কাজকর্ম কিছু হল না। ওরা বলল, সামনে পুজো পড়ে যাওয়ায় স্টাফরা এখন হলিডে মুডে। তাছাড়া যে-কাজের জন্যে যাওয়া-সেটা নিয়ে একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে। ওদের অফিসিয়াল প্রবলেম। পুজোর পর যা হবার হবে। আপাতত কিছু হচ্ছে না। তো আমি আর কী করব! গেস্ট হাউসে মঙ্গলবার কাটিয়ে আজই ব্যাক করলাম।'

'বেশ করলে! কিন্তু কার সুটকেস নিয়ে এসেছ।'

'কেন! তোমার!'

'আমার নয়।'

'তোমার ছাড়া কার হবে!'

'বলছি আমার নয়। আমার সুটকেসের মতনই দেখতে। তবে রঙ একটু আলাদা।'

'উহুঁ, তোমারই সুটকেস।'

'আমাকে খেপিয়ো না। বলছি আমার নয়। আমার সুটকেস অমন ময়লা নয়। আর যদি আমার হত, ডুপ্লিকেট চাবিতে খুলে যেত। কত কষ্ট করে ডুপ্লিকেট চাবি খুঁজে ওতে লাগালাম। খুলল না।'

'খুলল না? না, তুমি খুললে না।'

'মানে। আমি এক গোছা চাবি, এটা সেটা নিয়ে কত চেষ্টা করলাম, খুলতে পারলাম না—আর তুমি বলছ, আমি খুললাম না!'

'আমি তো দেখলাম, খোলাই। মুখ উলটে পড়ে রয়েছে। দু একটা বেরিয়ে রয়েছে....।'

'কী। কী বললে খোলা!'

'দেখো তুমি!'

'সরো।' কস্তুরী তাড়াতাড়ি মানুষটাকে নিজের গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। অন্ধকারে বোঝা যায় না। আলো জ্বালল। তার গায়ের আলগা শাড়ি বিছানায় ছড়ানো। শাড়িটা টেনে নিয়ে পায়ে জড়াতে জড়াতে কস্তুরী সুটকেসের দিকে তাকাল। সত্যিই তো ওলটানো সুটকেসের মুখ খোলা বলেই মনে হচ্ছে।

এ কেমন করে হয়? তবে কী কস্তুরী পর পর এ-চাবি সে-চাবি লাগাতে লাগাতে চাবির কলটা আলগা করে ফেলেছিল! তারপর ছুরি কাঁটা স্ক্রু ড্রাইভার কত কী ঢুকিয়েছে তালার জায়গাটায়। কলটা হয়ত আলগা হয়ে গিয়েছিল। শেষে রাগ করে কস্তুরী যখন সুটকেসটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল—তখন ছিটকে পড়ার দরুন ধাক্কা লেগে আলগা মুখ খুলে গিয়েছে। কস্তুরী আগে লক্ষ্য করেনি।

সুটকেসের সামনে গিয়ে উবু হয়ে বসল কস্তুরী। সোজা করে দিল সুটকেসটা। ডালা খুলল।

ডালা খোলার পর কস্তুরীর চোখের পাতা আর নড়ল না।

স্থির দৃষ্টি তার যেন বিভ্রম লাগছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে কী কোনো স্বপ্ন দেখছে!

অবিশ্বাস আর আবিষ্ট চোখে সে তাকিয়ে থাকল ডালা খোলা সুটকেসের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে যেন সাহস করে হাত বাড়াল কস্তুরী। একটা একটা করে জিনিস তুলে নিতে লাগল। চিনতে তার অসুবিধে হচ্ছিল না। সব কেমন তাল গোল পাকিয়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে সুটকেসের মধ্যে।

কস্তুরী দু হাতে, যেন কোলে তুলে নিচ্ছে, এইভাবে জিনিসগুলো তুলে এনে বিছানায় রেখে দিতে লাগল। একবার দুবার তিন বার··সে সুটকেসের কাছে যায়-হাঁটু গেড়ে বসে, দু হাতে জিনিসগুলো তোলে। আবার নিয়ে এসে বিছানায় রাখে।

সবই বিছানায় জড় করল কস্তুরী।

তার বাবার একটা ফটো। কতকালের বাসী যেন। রঙ উঠে গেছে। পোকাও ধরেছে বুঝি। মায়ের কোলের শিশু কস্তুরী। মা বলত, তরী। ছেলেবেলায় একটা গরম জামা পা-ভাঙা পুতুল। কিশোরী বয়েসের ছেঁড়া স্কুলের বই। পাঁচ সাতটা পাখির পালক আর কাচের লক্ষ লক্ষ টুকরো, এক মুঠো কাচের টুকরো ভাঙা চুড়ির, প্রজাপতি ক্লিপ, হেয়ার পিন। কস্তুরী প্রতিটি জিনিস চিনতে পারছিল। ওই তো তার গানের ছেঁড়া খাতা, আগ্রার তাজমহলের রঙিন কার্ড, শুভদার দেওয়া সেই সোয়ান পেনের খাপ, কড়িগাঁথা বটুয়া ব্যাগ।

এগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল কস্তুরী।.... আর ও-গুলো? ওগুলো কে দেখবে? দেখবে না তুমি? হাতে নেবে না?

কস্তুরী কেমন ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তার আর হাত উঠছিল না।

কালো কালির একটা শিশি হাত থেকে আচমকা পড়ে গেলে

যেমন সর্বাঙ্গে কালি ছিটিয়ে পড়ে কস্তুরীর গায়েও সেই রকম কালি ছিটিয়ে পড়েছিল যৌবনের শুরুতেই। তার মা গলায় দড়ি দিল। পুলিসের এই ছোটবাবুকে মা জামাইবাবু বলত। সম্পর্ক ছিল। তার সঙ্গে শোয়াবসা করতে করতে মা একদিন আর পথ পেল না বেরিয়ে আসার। কস্তুরী তখনই জানতে পেরেছিল, সে আর তার বাবার সম্পর্ক লৌকিক, রক্তের নয়।

বাবা তাকে ঘৃণা করত। মা ওইভাবে মারা যাবার পর বাবা কস্তুরীকে যেসব কথা বলত-তা কানে আঙুল দিয়েও শোনা যায় না। কস্তুরী বাবাকে ছেড়ে এক মাসির বাড়ি চলে গেল। মাসি ছিল আধ পাগল। চাকরি করত হাসপাতালে নার্সের চাকরি। বাড়িতে এসে গায়ে কাপড় রাখত না। মদ খেত, হাতে ফিনাইল ঢালত, চেঁচাত, আর কস্তুরীকে বলত, 'তুই এত কালো কুচ্ছিত হলি কেন জানিনা! তোর মায়ের পেটের দোষ।··· আমার বাড়িতে তুই সখী সেজে থাকিস কেন ছুঁড়ি! গোপালের কাছে যা!'

কস্তুরী বুঝে ফেলেছিল। বাঁচতে হলে তার পক্ষে লতাগাছ হয়ে মাসিটাসিকে জড়িয়ে থাকলে চলবে না। তাকে নিজের মতন করে বাঁচতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে। সংসারে অনেক রকম ছোঁয়া-ছুঁয়ি আছে। যে বুদ্ধিমান-সে ছোঁয়া দেয় কিন্তু এঁটো হতে চায় না। লুকিয়ে উচ্ছিষ্ট হলে কে আর খোঁজ পায়।

কস্তুরী বুদ্ধিমতী হয়ে গেল ক্রমশ। কিছুটা সুবিধে হল তার। পড়াশোনার পাট আধাআধি চুকিয়ে সে চাকরি জুটিয়ে নিল। সারদা মেসোমশাইকে ধরে করে চাকরিটা পেয়েছিল। ভদ্রলোক নিজে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু কস্তুরী অন্যের কাছে হীন এবং নোংরা সাজিয়ে গোপিদা বলে একটি ছেলের দৌলতে আরও পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিল। গোপিদার সঙ্গে বছর দুই ভাব-ভালবাসার খেলা হল। কস্তুরী সবসময় বোঝাতে চাইত-তার মতন সর্বাঙ্গ শুদ্ধ মেয়ে আর সচরাচর দেখা যায় না। গোপিদার

খানিকটা পবিত্র-পবিত্র বাতিক ছিল। পরিশুদ্ধ কস্তুরীকে পেয়ে সে আপন আনন্দে বিভোর হয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত কস্তুরী মইয়ের খোঁজ পেয়ে গোপিদাকে ঠেলে দিল অন্যত্র।

এইভাবে কস্তুরী পরিণত হতে লাগল। তার মনোমতন 'পরিণত' হতে হতে দেখল, বয়েসটা পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সে যে স্বার্থপর, চতুর, আত্মকেন্দ্রিক, জেদি এগুলো ভাল করেই বুঝে গিয়েছিল। বাইরে প্রকাশ করত না। সে মুখে অনেক কিছু বলত, মামুলি মেয়েলি পরিচ্ছন্নতার কথা, শারীরিক পবিত্রতার কথা, সভ্যতা ভব্যতার কথা। মনে মনে সে অন্ধকারের কুয়ায় ডুবে থাকত। তার ঈর্ষা ছিল, উদ্দেশ্য ছিল, চাতুরি ছিল, হিসেব ছিল।

শেষ পর্যন্ত জ্যোতির্ময় বলে একজন কস্তুরীকে পছন্দ করে ফেলেছিল।

কস্তুরী তাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েও সরে গেল। জ্যোতির্ময় খানিকটা শক্ত ধাতের ছেলে। সে কস্তুরীকে কতটা সহ্য করতে পারবে, আর কতটাই বা আলগা দেবে, বা কস্তুরীর ফাঁপা ভালবাসার কোথায় টেক্কা দেবে—বুঝতে না পেরে, ভয়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে এল কস্তুরী।

জ্যোতির্ময় বলেছিল, তা ভালই হয়েছে।

এক বন্ধু বলল, 'ওর টাইপ হল মউমাছির।'

জ্যোতির্ময় বলল, 'না। হুলো। হুলো যদি মাছি হত—! ও ওই টাইপের।'

আরও পরে এল পঙ্কজ।

পঙ্কজ একসময় দিদি বলত কস্তুরীকে। কস্তুরীর যখন অবেলা নেমেছে তখন পঙ্কজ এল।

কস্তুরী প্রথমে ভয় পেয়েছিল তার দ্বিধা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বুঝল—তার কোনো অবলম্বন নেই, বন্ধু নেই, আশ্রয় নেই।

পঙ্কজকে সে অবলম্বন করতে পারে। পঙ্কজ এখনও ছেলেমানুষ, হালকা মজাদার।

বিয়ের পর কস্তুরী তাদের দাম্পত্য জীবন ও গার্হস্থ্য সম্পর্কের কোনো ফাঁক রাখেনি। পঙ্কজকে সে ভালবেসে ফেলেছিল!

কিন্তু, কোথাও যেন কী থেকে গিয়েছে। না থাকলে কস্তুরীর আজ আর রথী বাবুর কাছে যাবার কারণ থাকত না।

কস্তুরী সুটকেসটার ওপাশ থেকে আর কিছু তুলে নিতে ভরসা পেল না। তার ভয় করছিল।

একইভাবে বসে থাকল কস্তুরী।

ঘুম ভাঙল। স্বপ্নও যেন ধুয়ে গেছে তখন।

কস্তুরী শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় উঠেও পড়ল।

ঘরের মেঝেতে সুটকেসটা পড়ে আছে।

কই, খোলা বলে তো মনে হল না। বন্ধই রয়েছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। না, এ বড় অদ্ভুত! তাই না।

এই সুটকেসটা কস্তুরীর হোক না হোক, তারও একটা অন্য সুটকেস আছে। সেই সুটকেসের একটা চাবি পঙ্কজের কাছে। ওপর চাবি। অন্যটা-কস্তুরীর কাছে। তবে কস্তুরী কোনো দিনই পঙ্কজকে সেই চাবিটা দেবে না। বা সেই সুটকেসটাও—যা কস্তুরীর—কিন্তু পঙ্কজ জানে না।

তার জানার দরকার কী! এমন তো থাকেই।

নিগ্রহ

আমার ঘরে মুখার্জি ছেলেটিকে পেঁছে দিয়ে চলে গেল। আমি ওকে দেখলাম। সাধারণ ভাবে অন্যমনস্ক চোখে ইচ্ছাকৃত অমনোযোগ।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল। আমার টেবিল থেকে হাত পাঁচ সাত তফাতে। ওর মাথার চুল থেকে পায়ের চটি সবই আমার নজরে পড়ছিল। স্পষ্টভাবে। একমাথা রুক্ষ চুল। গায়ে নীল রঙের মামুলী বুশ শার্ট, পরনে খয়েরী ট্রাউজারস। পায়ের চটিটা নোঙরা। ছেলেটি মাথায় লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে। হাড়-হাড় চেহারা হলেও গড়াপেটা, মজবুত স্বাস্থ্য নয়।

'এদিকে এসো।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে এল না। দাঁড়িয়ে থাকল। বোধ হয় এই ঘরের থমথমে, চাপা আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করছিল। বুঝতে পারছিল না, আমি কে? কেন তাকে আমার ঘরে হাজির করা হয়েছে?

এই ঘর তেমন বড় নয়। মাঝারি। জানলা আছে, তবে আপাতত বন্ধ। ভারী পরদা টানা রয়েছে আগাগড়া জানলায়। বাইরের ছিটে ফোঁটা রোদ আসছে না, আলো প্রায় নয়। কোনো শব্দই শোনা যায় না। দুটো আলো, একটা মাথার ওপর অন্যটা দেওয়ালে এমন-ভাবে জ্বলছে যেন ছেলেটিকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। নিজে আমি একটু আবছায় বসে আছি। এখন গরম কাল নয়, তবু মাথার ওপর পাখাটা মিহি রি-রি শব্দে ঘুরছিল।

আবার ছেলেটিকে ডাকলাম। সাধারণ ভাবে।

এবার সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

'বসো'।

ছেলেটি ইতস্তত করল। তার সাহস হচ্ছিল না।

'কী হল? বসো।'

ছেলেটি বসল।

'তোমার নাম?'

'সুবোধ।' ছেলেটির গলা জড়িয়ে গেল, ভাঙা ভাঙা শোনাল।

'সুবোধ হালদার।' আমি হাসলাম না, রুক্ষ হলাম না, অথচ বুঝিয়ে দিলাম আমি ওর পুরো নামটাই জানি।

সুবোধ আমাকে দেখছিল। ভয়ের চোখে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

'এখানে কত দিন আছ?'

'এক মাসের বেশি।'

'এক মাস উনিশ দিন। ঠিক?'

সুবোধ যেন আরও অস্বস্তি বোধ করল।' আপনি সব জানেন?'

জানি। কিন্তু স-ব কী?

সিগারেটটা ধরাবার জন্যে লাইটার খুঁজছিলাম।' তোমার কাগজপত্র দেখেছি।'

সুবোধের বাপের কাগজপত্র সমেত ফাইলটা আমার সামনে টেবিলে পড়ে ছিল। মুখার্জি গত পরশু দিয়ে গিয়েছিল। দেখেছি সব। সুবোধের কথা মুখার্জিরা আমায় আগেও বার কয়েক বলেছে।

সিগারেট ধরালাম। সুবোধের মুখ খানিকটা লম্বা ধরনের। চোয়াল ভাঙা। গালে কয়েকটা ব্রণর দাগ। থুতনি শক্ত এবং চাপা। নাকের ডগা রীতিমতন মোটা কপালের ডান দিকে বড় আঁচিল।

'তুমি কলকাতায় থাকো?

'দমদমে।'

'তোমার বয়স? তেইশ না চব্বিশ?

'তেইশ।'

'পড়াশোনা কতদূর?'

'বেশি দূর নয়। বি. কম শুরু করেছিলাম।'

তোমার কি শীত করছে?'

আমার বেখাপ্পা প্রশ্নে সুবোধ কেমন থতমত খেয়ে গেল। এটাও আমার ইচ্ছাকৃত। মানুষের স্বভাব হল, স্বাভাবিক কথাবার্তা বেশিক্ষণ বলতে দিলে সে ধাত পেয়ে যায়। আপাতত সুবোধকে খানিকটা এলোমেলো করে রাখাই আমার দরকার।

'শীত? না শীত নয়,' সুবোধ খাপছাড়া ভাবে বলল।

আমার মনে হল, সুবোধের শীত শীত করছে। এখন কার্তিক মাসের শেষ। সকালে রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে এখানে। সকালে এক একদিন ঘন কুয়াশা জমে। রাত্রে হিম পড়ে। এখন অবশ্য না সকাল না সন্ধে। দুপুরের শেষ। জানলার পরদা সরিয়ে কাচের পাল্লা গুলো খুলে দিলে আলো আসবে, মরা রোদ দেখা যাবে মাঠে-ঘাটে।

পাখাটা বন্ধ করার উপায় ছিল না আমার। সামান্য আগে কপাল গলা ভিজে গিয়েছিল ঘামে। সল্‌ট ট্যাবলেট খেয়েছি জলে গুলে। এই ঘামকে বলে টেনসন সোয়েটিং। শীত গ্রীষ্ম বলে কথা নেই, উত্তেজনা থাকলেই ঘাম হবে। ইদানীং এটা হচ্ছে আমার। বয়েসের জন্যে বোধ হয়। কিংবা মনের জোর হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের পেশায় পঞ্চাশই যথেষ্ট। তারপর শরীর আর মনের স্বাভাবিকতা থাকে না।

তুমি গলার দিকে বোতাম এঁটে দিলে—তাই মনে হল,' আমি বললাম। সিগারেটের ধোঁয়া গিলে একবার ফাইলটার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ তুললাম।' তোমার বাড়ির কথা বলো। কে কে আছেন?'

'সুবোধ গলা পরিষ্কার করল। 'অনেক আছে।'

'মা বাবা, বোন ভাই বিধবা এক পিসিও বোধ হয়।' আমি এবার একটু হাসি মুখ করলাম।

'আপনি তো সবই জানেন।' সুবোধ অবাক হল না আর।

'কাগজপত্র দেখে যা জেনেছি। তা তোমার বাবার বয়স কত?'

'কাগজে লেখা নেই?' সুবোধ যেন অন্য গলায় বলল, একটু খোঁচা থাকতে পারে।

'যা জিজ্ঞেস করছি বলো।' আমার গলা নিজের থেকেই শক্ত হয়ে গেল।

সুবোধ চোখ নামাল। ''বাবার ঠিক বয়স আমি জানি না। বছর ছাপান্ন।'

'এখনও চাকরি করেন?'

'হ্যাঁ। সিনেমা হাউসে। বুকিং কাউন্টারে।'

'তোমাদের একটা দোকান আছে?

'না দোকান নয়। আমার ভাই একটু জায়গা ঘিরে নিয়ে বসে ইলেকট্রিকের কাজকর্ম করে।

'তোমার মা স্কুলে কাজ করেন?'

'পড়াশোনার কাজ নয়। স্কুলের অফিসে। সামান্য কাজ।'

'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

'বাড়ি? জানি না। দেখিনি।

আমি সুবোধের মুখচোখ লক্ষ করছিলাম। বাড়ির কথাবার্তা বলতে আর ভাল লাগছিল না। বিরক্ত হচ্ছিল।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে নিবিয়ে দিলাম। দেওয়ালে ঘড়ি ঝুলছে। তিনটে দশ। বাইরে রোদের তাত কমছে বোধ হয়। জানলার পরদা সরিয়ে পাললাগুলো খুলে দিলে ছেলেটা আরাম পাবে। বাইরে আকাশবাতাস মনোরম। হেমন্তের পালানো রোদ মটর ক্ষেতের মাথায় বসে ধুলো ঝাড়ছে যেন গায়ের।

'তোমার দেশ কোথায় জান না?'

'শুনেছি যশোর।' শোনা কথায় দেশ। দেখিনি।

'তোমরা কি বরাবর কলকাতায়?

'খাস কলকাতায় নয়। আমি টালিগঞ্জে জন্মেছি। আমরা টালিগঞ্জ বেহালা, পাতিপুকুর অনেক জায়গায় থেকেছি ভাড়া বাড়িতে। বস্তিতে।'

'বস্তিতে?'

'আজকাল বস্তিই বেশি।' সুবোধের গলা যেন ঠাট্টার মতন শোনাল। 'বস্তিতেই বেশি লোক থাকে। আমাদের মতন লোক।'

আমি কিছু বললাম না। ওকে অল্প স্বল্প সহজ স্বাভাবিক হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বরং আরও একটু বেশি হালকা হতে দিলেও ক্ষতি হবে না।

'তা ঠিক,' আমি মাথা নাড়ালাম, 'কলকাতার দশ আনাই শুনেছি বস্তি হয়ে গিয়েছে। এক একটা ভাড়াটে বাড়িতে বিশ ভাড়াটে। আউট স্কার্টের কলোনিগুলো নাকি নরক।'

'লোকে তাই বলে।'

আমার চশমটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। চশমার পাশে ডট পেন। ডট্ পেনটা তুলে প্যাডের ওপর রাখলাম। তারপর আচমকা বললাম, 'এখানে তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে?'

সুবোধ যেন আমার কথা ভাল বুঝল না।

'তুমি তিন নম্বর ব্যারাকে আছ না?'

'হ্যাঁ।'

'তিন নম্বরটা সবচেয়ে ভাল। স্পেশাল ব্যারাক। নতুন হয়েছে। অঢেল রোদ, বাতাস, স্যানিটারি অ্যারেঞ্জমেণ্টও খুব ভাল। তাই না?

'হ্যাঁ, কিন্তু জানলার বাইরে লোহার জাল। বাইরে তাকালে কম্পাউণ্ড ওআলের মাথায় কাঁটা তার। আপনাদের লোকজন পাহারা দেয় বসে থাকে।'

কথাগুলো আমি শুনেছি এমন কোনো ভাব করলাম না। আবার আচমকা বললাম, 'তুমি গায়ে মাথায় মাখার জন্যে সাবান-টাবান পাচ্ছ

তো ? ওয়াশিং সোপও আমরা দি। মশার তেল পেয়েছ ? এখানে খুব মশা। ম্যালেরিয়া হতে পারে। বী ভেরি কেয়ারফুল। আমাদের মশার তেলটা খুব ভাল। মিলিটারি থেকে সাপ্লাই পাই। তিন চার ফোঁটা হাতে নেবে, মাখিয়ে নেবে হাতে জাস্ট বুলিয়ে নেবে। শরীর যে কোনো ওপেন পার্ট-এ ইউজ করবে। কোনো ক্ষতি হবে না। ভাল কথা, তোমার ডান পায়ের থাইয়ের এক জায়গায় ইনজিউরির দাগ আছে। ওটা কিসের ? বোমা-টোমার চোট ?'

সুবোধ কেমন চমকে উঠল। তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই ব্যাপারটাও আমার জানা।

মনে মনে আমি কৌতুক অনুভব করেছিলাম। সুবোধ নিশ্চয় বুঝতে পারছে না, আমি তাকে আরও কতভাবে অবাক করে দিতে পারি।

সুবোধ বলল, 'না, বোমার নয়।'

'বোমার নয়। কিসের দাগ ?'

'একবার তার-কাঁটার ওপর পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেমন করে ? তোমার পিঠের দিকেও সামান্য দাগ আছে।'

'আমাদের পাড়ার একটা একতলা বাড়ির নেড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'ও ! কত দিন আগে ?

সুবোধ বেশ বিরক্ত হল। বুঝতে পারছিল আমি তার কথায় সন্দেহ করছি। ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'দু-তিন বছর আগে। হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। আর জি কর। ওখানে খাতায় লেখা আছে।'

সুবোধ রেগে যাচ্ছিল। কম বয়েসে রাগটা চট করে হয়। সুবোধকে মাঝে মাঝে রাগানোও আমার দরকার। রাগানো ভোলানো।

আমি আবার একটু নরম হয়ে গেলাম।' ছোটখাট ব্যাপারেও ওই পুলিসের বড় সন্দেহ বুঝলে হে, নিজের বাপকেও সন্দেহ।

ওরা একেবারে অমানুষ। আমি কিন্তু পুলিস নয়। নাথিং টু ডু উইথ দেম। তোমার কাগজপত্রে নানান রকম কেচ্ছা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই বললাম চা খাবে?

'না।'

'আরে রাগ করছ কেন? খাও, একসঙ্গেই খাওয়া যাক। সাড়ে তিনটে বেজে গিয়েছে। তোমার তো আবার শীত শীতও করছে।' বলে আমি টেবিলের তলায় সুইচে হাত দিলাম। বাইরে কলিং বেল বাজবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার আরদালি মোহন এল।

'চা দাও। দু কাপ। পাখাটা বন্ধ করে দাও।"

মোহন পাখার সুইচ বন্ধ করল। করে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

আমি একটু হাসলাম। নরম হাসি। "দেখো সুবোধ, যার যা কাজ তা না করে উপায় নেই। আমারও সেই অবস্থা। আমার কাজটা ঝকমারি। তবু ভাল পুলিসের কাজ নয়। পুলিসদের আমি নিজেও পছন্দ করি না। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, আমার মেয়ে—তা ধরো বয়েস এখন একুশ, আমাদের ফার্স্ট চাইল্ড তার বিয়ের এক সম্বন্ধ এসেছিল আই পি এ ছেলের সঙ্গে। না করে দিয়েছি। আমার স্ত্রী একটু খুতখুত করছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম, হাজার ভাল হোক, অনেস্ট হোক—পুলিস-পুলিস, দেয়ার ইজ সাম ডাট অন দেম ইউ কেন নেভার ওয়াইপ আউট। তা তোমারও তো একটি বোন রয়েছে। কত বয়েস? আমি খোলামেলা গল্প করার ঢঙে, খানিকটা অন্তরঙ্গ হয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। ইচ্ছে করেই। কথা শেষ করে বাকি জলটা খেয়ে নিলাম। সল্ট ট্যাবলেটের নোনতা স্বাদ। আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

সুবোধ বলল, 'আমার বোন আর ছোট ভাই যমজ। বোনের বয়েস কুড়ি।'

'আমার মেয়েরই সমবয়েসী। কিন্তু যমজদের ব্যাপারে একটা পিকিউলিয়ারিটি আছে। যমজরা সাধারণত একই রকম হয়। ছেলে তো দুটোই ছেলে, মেয়ে তো দুটোই মেয়ে। এক ছেলে এক মেয়ে দেখা যায় না। তাই না?

'আমি ঠিক জানি না।'

'নজর করেনি আর কি। আরও দু এক জোড়া যমজের কথা ভাবলে বুঝতে পারবে। তোমার বোনের নাম কী?

'ডাক নাম বেলা।'

'বিয়ে থা দিতে পারনি? কী যেন করে দেখছিলাম?'

সুবোধ তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারল, আমার জানা আছে তার বোন বেলা কী করে। সামান্য পরে বলল, 'বাড়ি বাড়ি ধুপ আচার, মোরব্বা বিক্রি করে।

সিগারেটের ধোঁয়া গিলে চুপচাপ বসে থাকলাম। আমার আর ঘুম হচ্ছিল না। টেনসান যে কেটে গিয়েছে তা নয়, সয়ে গিয়েছে। এ-রকম হয় আমার। আগে উত্তেজনা এবং মানসিক দুর্বলতা থাকে, কেমন একটা অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা সেটা ধীরে ধীরে কেটে যায়। ধাতস্থ হয়ে পড়ি।

মোহন চা নিয়ে এল। রাখল। তাকে ইশারায় আমি কিছু বললাম। সে আমার ডানপাশের ঘরের দরজার চাবি খুলল। ভেতরে গেল। ফিরে এল। ইশারায় জানাল সব ঠিক আছে।

চলে গেল মোহন।

'নাও চা খাও।'

সুবোধ চায়ের দিকে তাকাল। মুখ দিল না।

মনে মনে আমার মজা লাগছিল। সুবোধ বোধ হয় ভাবছে চায়ের সঙ্গে কিছু মেশানো আছে। না, তেমন কিছু নেই। যা আছে তাতে ওর উপকার বই অপকার হবে না।

চায়ে মুখ দিয়ে আমি বললাম, 'খাও'।

সুবোধ আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য দ্বিধার সঙ্গে চায়ের চুমুক দিল।

'সিগারেট খাবে?

আমার আচমকা প্রশ্নে সুবোধ থতমত খেয়ে গেল। ছোট করে বিষম খেল একবার।

'না।' মাথা নাড়ল সুবোধ।

'তুমি সিগারেট খাও না?

'খাই।'

'এরা তোমায় সিগারেট দেয় না?

'দেয়। এক প্যাকেট। সস্তা সিগারেট।'

'তুমি কি দামী সিগারেট খেতে?

'না। কোথায় পাব। যা খেতাম তাই দেয়।'

'আমাদের যা নিয়ম তার বাইরে কিছু দেবার উপার নেই। তা হলেও তুমি দেখেছো—আমাদের সব রকম ব্যবস্থাই ভাল। খাওয়া শোওয়ার কোনো কষ্ট নেই। আমরা সাধ্যমতন তোমাদের আরামে রাখার চেষ্টা করি। ঠিক।'

সুবোধ কোনো কথা বলল না। চেষ্টা করল হাসার। ওর দাঁতের, সামনের দাঁতের সামান্য দেখা গেল। শক্ত। সুবোধের চোখ খানিকটা লালচে দেখাচ্ছিল। কেন কে জানে।

'নাও, সিগারেট নাও। যদিও তুমি আমার ছেলের বয়েসী, তবু নাও। লজ্জার কিছু নেই।' আমি হাসলাম, প্যাকেট লাইটার এগিয়ে দিলাম। 'কি একটা শ্লোক আছে না—কত বছর বয়েস হয়ে গেলে যেন ছেলেদের সঙ্গেও বন্ধুর মতন ব্যবহার করতে হয়।'

সুবোধ হাত বাড়াল না, সিগারেটও নিল না। চায়ে চুমুক দিল আবার।

আমার মজা লাগছিল। এই সব ছেলে ছোকরাদের এক ধরনের অবাধ্যতা থাকে। বেয়াড়াপনা ঠাণ্ডা করতে আমাদের বেশি সময়ও লাগে না। তবু এখন এই মুহূর্তে আমি কিছু করতে চাই না।

তুমি আর কি নেশা কর?' আমি বললাম, শান্ত গলায়, গল্প করার মতন আমেজী ঢঙে।

'নেশা আর কোনো নেশা করি না।'

'মদটদ খাও?'

'না।'

'গাঁজা, চরস? হ্যাশিস?'

'না না।'

'কিছুই না বাঃ, তুমি তো ভাল ছেলে। আজকাল যে কী হয়েছে বুঝতে পারি না। ছেলে ছোকরা দেখলেই কতকগুলো দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দি। ফরনাথিং কতকগুলো ভাইসেস তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। এই যেমন তুমি। তোমার কাগজপত্রের মধ্যে দেখছিলাম—তুমি সিগারেটের মধ্যে গাঁজা ঢুকিয়ে খাও।'

'মিথ্যে কথা। আমি গাঁজা খাই না।'

'আচ্ছা! মদও নয়?'

'এক আধ দিন খেয়েছি।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মদ গাঁজার খুব চল। কী বলো?'

'অনেকে খায়।'

ড্রয়ার টেনে আমি ভেতরে হাত ডোবালাম। আঙটিটা এবার পালটে নেওয়া উচিত। সুবোধ চা খাচ্ছে।

'তোমার বোনের কথা হচ্ছিল তাই না,' আমি আঙটি পালটাতে পালটাতে বললাম, 'কি যেন নাম বললে? বেলা। তা এই বেলার সঙ্গে যে ছেলেটা ঘুরত, তাকে তুমি ছুরি-ছোরা মেরেছিলে নাকি?'

সুবোধ খানিকটা থতমত খেয়ে গেল, তাকিয়ে থাকল। এমন করে আমায় দেখছিল যেন বুঝতে পারছিল না, আমি সর্বজ্ঞ কি না!

আমি চা শেষ করলাম।

সুবোধ বলল, 'আমি ছুরি মারিনি।'

'কে মেরেছিল?'

'জানি না।'

'তুমি কিছুই জান না? এত ন্যাকা-বোকা তো তুমি নও হে!' হঠাৎ আমি বললাম।

সুবোধের মুখ সামান্য অন্যরকম হয়ে গেল। মনে হল, যেন ঠাস করে আমি ওর গালে চড় মেরেছি।

ওকে সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়েই আমি বললাম, 'তোমার বোন ক'বার নার্সিং হোমে গিয়েছে?'

সুবোধ স্তম্ভিত। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল বোকার মতন। ক'মুহূর্ত পরেই তার চোখ ঘৃণায় কেমন জ্বলে উঠল।

'লজ্জার কিছু নেই', আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে। বাইরের কেউ শুনতে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আজকাল তো এ-সব জল-ভাত। ...ক' বার?'

সুবোধ উঠে দাঁড়াল। 'আপনি আমার বাড়ির লোকদের সম্পর্কে...।'

'বসো। মাথা গরম করো না। এখানে মাথা গরম করতে নেই। তাতে তোমার লাভ হবে না। বসো।'

আমার গলার স্বর হঠাৎ এত শক্ত, কঠিন হয়ে গেল যে সুবোধ বোধ হয় চমকে গেল। আবার বসল।

'তোমার বাড়িকে বাদ দিয়ে কথা বলতে পারলে ভাল হত। আমি খুশী হতাম। কিন্তু তার উপায় নেই। তোমার বাড়ি তোমায় তৈরি করেছে।...আগে তোমার বোনের কথা হোক—তারপর তোমার মা বাবার কথায় আসছি। ..বলো, 'তোমার বোন ক'বার নার্সিং হোমে গিয়েছে?'

সুবোধ দাঁতে দাঁত চাপছিল। 'একবার।'

'দু বার।'

'না।'

'প্রথম বার সে বাড়ি ছেড়ে দিন সাতেকের জন্যে কোথায় গিয়েছিল?'

'কেষ্টনগর, আমাদের এক মাসীর বাড়ি।'

'দ্বিতীয় বার কেন গিয়েছিল?'

'বিষ খেয়েছিল।'

'কেন?'

'মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল।'

'তুমি আমায় এত বোকা ভাবছ কেন হে,' আমি হাত বাড়িয়ে সুবোধের ফাইলটা টেনে নিলাম। 'মা মেয়ের ঝগড়া কোন বাড়িতে না হয়। শুধু ঝাগড়ার জন্যে কেউ বিষ খায়? তা ছাড়া বাপু নার্সিং হোমে মেয়েকে রাখার ক্ষমতা তোমার মা-বাবার তোমার আছে বলে তো বিশ্বাস হয় না। ও-সব বড়লোকী ব্যাপার কি তোমাদের পোষায়।'

সুবোধ এবার আর কোনো কথা বলল না। তাকে অসহায় দেখাচ্ছিল। ফাঁদে পড়ে গিয়েছে।

'তোমার বাবা আর মায়ের মধ্যে বণিবনা কেমন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তাকিয়ে থাকল সুবোধ। তার চোখ সামান্য যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মোটা মোটা ভুরু, কপালের মাঝামাঝি এত ময়লা যে মনে হয় ঘা-টা কিছু হয়েছিল এক সময়।

'কী হল, কথা বলছ না? তাড়াতাড়ি করো—।'

'বাবা বদমেজাজী। খায় দায় তাস খেলে আর সিনেমা হাউসে গিয়ে বসে থাকে।'

'শখের তাস না জুয়া?'

'জুয়াও খেলে।'

'নেশা ভাঙ করার অভ্যেস আছে?

'আছে।'

'তোমার মা কত দিন স্কুলের কাজটা করছেন?'

'চার পাঁচ বছর।'

'কেন?'

'পয়সার জন্যে। বাবার রোজগার কম। সেই টাকায় সংসার চলে না। বাবা যা পায়—তারও খানিকটা নষ্ট করে। মা স্কুলের চাকরিতে সোয়াশো দেড়শো টাকা পায়। মায়ের চাকরি ঝিয়ের মতন। স্কুলের অফিসে টেবিল চেয়ার পরিষ্কার করে, খাতা গোছায়, দিদিদের ফরমাস খাটে, বড়দি—মানে হেড্‌মিস্ট্রেসের এটা-ওটা করে দেয়। মা সামান্য লেখাপড়া জানে। ভাল কাজ আর কি করবে।'

'তুমি কী করতে?'

'কিছু না।'

'চাকরি বাকরি করতে না কেন?'

'কেউ দিত না। দু এক জায়গায় এক আধ মাস্ করেছি। তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ঠিক আছে।···এবার তোমায় নিয়ে একটু পাশের ঘরে যাব। বেশিক্ষণ না, ঘণ্টাখানেক; তারপর তোমার ছুটি।

॥ দুই ॥

ঘরে ঢুকে সুবোধ দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন ভয় পেয়েছে। আমি তার পেছনে ছিলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

এই ঘরের চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে ভয় পাবার কিছু নেই। সরু লম্বা ঘর। ছোট। একটি মাত্র লম্বাটে জানলা। জানলা বন্ধ। পরদা ঝুলছে। ঘরের মাথার দিকে ঘুলঘুলিতে একটা এক্সজস্ট ফ্যান, পাখাটা চোখে পড়ে না। সেটা ঘুরছিল। শব্দ হচ্ছিল সামান্য। দুটি মাত্র চেয়ার ঘরে। একটা টেবিল—লম্বা সরু ধরনের, ডাক্তারদের রোগী দেখার চেম্বারে যেমন থাকে। আপাতত

মিহি বাতি জ্বলছিল ঘরে। জোরালো বাতিগুলো নেভানো। সেগুলো কোনটা কোথায় বোঝা যায় না। বোঝা যায় না—এই ঘরের দেওয়ালে একটা চোরা ছোট কাবার্ডও রয়েছে। একেবারে স্তব্ধ ঘর। পাখার এক ঘেয়েমি শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ শোনা যায় না।

'ওই চেয়ারটায় বসো তুমি' আমি বললাম। বলে একটা চেয়ার দেখালাম।

সুবোধ বসা-গলায় বলল, 'এই ঘরটা কিসের?'

'এমনি ঘর। বেশ নিরিবিলি।' বলে আমি একটু হাসির গলায় বললাম, 'আমি নাম দিয়েছি, জতুগৃহ।

'জতুগৃহ?'

'আরে মহাভারতের জতুগৃহ নয়। পুড়িয়ে মারার জন্যে তৈরি হয়নি। যাও, বসো।'

'চেয়ারের মাথার পাশে ওটা কী?'

'কিছু না। আলো। নেভানো রয়েছে। তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

সুবোধ চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। 'আমার কেমন ঘুম পাচ্ছে।'

'একটু পেতে পারে। যদি বেশি পায় টেবিলে শুয়ে পড়ো।'

সুবোধ চেয়ারে বসল। ওর মুখ বলছিল ও ভয়ে পেয়েছে, তবু এক ধরনের নিরুত্তেজনায় তার চোখ মুখ ঠোঁট কেমন শান্ত, শুকনো দেখাছিল। দেখানোই স্বাভাবিক। চায়ের সঙ্গে যে ওষুধটা মেশানো ছিল—তা ওকে ক্রমশই খানিকটা অবশ, শান্ত, অচঞ্চল করে তুলবে। ঘুমঘুম পাবে, আলস্য অনুভব করবে। এক ধরনের আচ্ছন্নতা আসবে সুবোধের, তন্দ্রার মতন অবস্থায় থাকবে।

সুবোধ বলল, 'আমাকে এখানে কেন এনেছেন?'

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। বসলাম না। হাতের ঘড়িটা দেখলাম

এক পলক। চারটে পাঁচ। ঘণ্টা খানেকের বেশি আমার লাগবে না।

'তোমার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চাই, 'আমি বললাম।

'এতোক্ষণ তো জানলেন। আপনার সবই জানা আছে।'

'মোটামুটি', আমি টেবিলের দিকে সরে গেলাম। 'তোমার কাগজপত্রের মধ্যে বানানো কথা রয়েছে অনেক। তুমি আমায় সত্যি কথা বলবে। লুকোবে না। আমি সত্যি-মিথ্যের তফাত ধরতে পারি।' বলে আমি পকেট থেকে পেনসিলের মতন সরু ইঞ্চি ছয় লম্বা চবচকে একটা জিনিস বার করলাম। দেখালাম সুবোধকে।

'ওটা কী?' সুবোধ বলল।

আমি হাসির মুখ করলাম। 'তেমন কিছু নয়। ডিটেক্টার। এটা ইলেক্ট্রোনিক্যালি অপারেটেড এক রকম টর্চ। ইনফ্রারেড রে বেরুবে জ্বাললে। তোমার চোখের পাতায় আলোটা দিয়ে রাখলে ভীষণ যন্ত্রণা হবে। গরম লাগবে খুব। মনে হবে চোখের পাতা, মণি পুড়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ রাখলে অন্ধও হয়ে যেতে পার।'

সুবোধ হতবাক। ভয় পেল। 'আপনি আমায় অন্ধ করে দেবেন?'

'না না', আমি মাথা দোলাতে লাগলাম, 'আমি কেন অন্ধ করব। তুমি যদি চাও হতে পার। তোমার ওপর নির্ভর করছে।...এই আঙটিটা দেখছ?' আমি ডান হাত বাড়িয়ে আঙটিটা দেখালাম।' এটা আমার আবিষ্কার। মাছির কত চোখ, জান? মাথা ভরতি চোখ। এই আঙটিটার মাথায় সুতোর মতন সরু সরু গোটা পঁচিশ ছুঁচ আছে। ভেরী শার্প অ্যান্ড হার্ড নিড্‌ল্‌স। তোমার ঘাড় আর মেরুদণ্ডের কাছে যদি টিপে ধরি যন্ত্রণায় মরে যাবে।'

সুবোধ শিউরে উঠল। তার ঠোঁট মুখ এত শুকিয়ে গেল যে জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে লাগল। ঢোঁক গিলল বার কয়েক।

টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে আমি ওকে আশ্বাস দেবার গলায় বললাম, 'সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি ঠিক ঠিক বললে,

সত্যি কথা বললে এ-সবের দরকার হবে না। মিথ্যে বললে…!'

সুবোধ শুকনো ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ক্লান্ত চোখ সামান্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ভয়ের সঙ্গে ঘৃণা ছিল দৃষ্টিতে। বোধ হয় সে ভব্য কোনো শয়তানের চেহারাটা দেখছিল।

'আমায় একটু জল খাওয়াবেন?' সুবোধ বলল।

'এখন নয়। পরে।'

'আমার তেষ্টা পাচ্ছে।'

'পাক।'

চুপ করে গেল সুবোধ। কিছু ভাবছিল। মাটির দিকে চোখ। সামান্য পরে মাথা তুলল।' 'কী জানতে চান আপনি?'

'তুমি নিজেই বলো। আমার যা জানার আমি জেনে নেব।'

সুবোধ জামার গলার কাছের বোতামটা খুলে ফেলল। বলল, 'আমার বাড়ির কথা আপনি জানেন। আপনার কাছে যে কাগজপত্র আছে তাতে দেখেছেন। তবে সেটা সব নয়, বাজে কথাও রয়েছে অনেক।…আমার বাবার কথাই বলি। বাবা একসময়ে সিনেমার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করত। মেশিন সারানোর কাজ। মেকানিক। তাতে পয়সাকড়ি ছিল। চুরিচামারির জন্যে কাজটা যায়। তারপর বসেছিল অনেক দিন। শেষে হাতেপায়ে ধরে লাহাবাবুদের সিনেমায় বুকিং কাউণ্টারে কাজ জোগাড় করে। বাবাকে ওরা বিশ্বাস করে না। টিকিট বিক্রির সময় কেউ না কেউ পাশে থাকে। তবু ওই কাজটাই বাবার ভরসা।'

সুবোধ থামল একটু। ঢোঁক গিলে গলা ভিজিয়ে নিল। 'বাবার স্বভাবে কোনো দায়দায়িত্বের বালাই নেই। আমরা ছেলেবেলা থেকে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির মতন বেড়ে উঠেছি। কোনোদিন দেড় কি দু'খানা ঘরের বেশি দেখিনি। আলাদা জলকল পায়খানা পাইনি কখনো। আমার পিসি বিয়ের দু বছরের মাথায় বিধবা হয়ে

আমাদের কাছে চলে আসে। পিসেমশাই কর্পোরেশনে কাজ করত। ট্রামে কাটা পড়ে মারা যায়। পিসেমশাইয়ের কিছু পয়সাকড়ি জমানো ছিল। তার মা আর ভাই পিসিমার পেছনে লেগেছিল। ভাইটা পিসিমাকে শুতে-বসতে-কাপড় ছাড়তে দিত না। পিসিমা পালিয়ে এল আমাদের কাছে। কিছু পয়সাকড়ি হাতে পেয়েছিল পিসিমা। ছেলেবেলা থেকে আমরা যে যার মতন চরে বেড়ালেও পিসি আমাদের মানুষ করেছে।'

'তোমার মা?'

'বলছি, শুনুন। দেড় দু'খানা ঘরে গাদাগাদি করে ছ'জন মানুষ থাকতাম। মা-বাবা একঘরে, বাকি চার জন অন্য ঘরে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মা আর বাবা ঝগড়া করত। বাবা ম্যাটিনী শোয়ের টিকিট বেচতে দুপুরে বেরিয়ে যেত—তারপর বাড়ি ঠাণ্ডা হত। বাবা বাড়ি ফিরত রাত্তিরে। বেশির ভাগ দিন দিশী খেয়ে। মা বাবায় আবার লাগত। মাঝে মাঝে হাতাহাতি। বাবা নেশার ঘোরে কাপড়চোপড় খুলে ফেলত, পেচ্ছাপ করত ঘরে দাঁড়িয়ে। মা বাবাকে মারত। পিসি মাঝখানে গিয়ে পড়লে দু-তরপের গালাগাল হজম করত।···আমার মা সংসার ঠেলে ঠেলে আর বাসন মেজে মেজে রোগ বাঁধিয়ে ছিল নানান রকম। পয়সা নেই বলে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ধরেছিল মা। তার নাম গোকুল। লোকটার চোখ টেরা ছিল। সবাই বলত টেরা গোকুল। টেরা গোকুল মাকে একটু ভালই বাসত। বলত এক দেশের লোক। মা পিসিকে টেরা গোকুলের বাড়িতে পাঠাত যখন তখন। তারপর পিসি একদিন গোকুলের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল। প্রথম প্রথম সন্ধের পর বাড়ি আসত, তারপর আর আসত না। পিসি এখন বারাসতে থাকে। তার ছেলেপুলেও হয়েছে।'

সুবোধ গলা ভেজাবার জন্যে লালা গিলল। এখন তার চোখ-

মুখ আরও শুকনো, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। চোখের পাতা আরও যেন ছোট হয়ে এসেছে।

'তারপর?' আমি শুধোলাম।

'তারপর?...হ্যাঁ—তার পরও আছে। জন্তু-জানোয়ার, রাস্তার কুকুর, ফুটপাথের বাচ্চাকাচ্চাও বড় হয়। তারা কী খেয়ে বড় হয়, কেমন করে বড় হয়—সে-সব আপনারা ভেবে দেখবেন। আমরাও বড় হয়ে উঠেছি গাদাগাদি করে, মাটিতে শুয়ে, উকুনভরা ছেঁড়া তোশকের ওপর ঘুমিয়ে। শীতের দিন একটা কাঁথা একা কোনোদিন গায়ে দিতে পারিনি। আমি স্কুলে পড়েছি শেষ ক্লাস পর্যন্ত। পিসির জন্যে। কলেজেও ঢুকেছিলাম। পিসি থাকলে দশ-বিশ টাকা জুটত। মা-বাবা দু বেলা খাওয়াতেই পারে না তো পড়া। আমার ভাই এইট্ পর্যন্ত পড়েছে। শম্ভু—আমার ভাইয়ের মাথা মোটা। খাটতে পারে। অত রোগা, তবু ঘোড়ার মতন খাটে। শম্ভু পাড়ার ইলেকট্রিসিয়ান হরিদার দোকানে ভিড়ে গিয়েছিল। কাজ শিখেছে। এখন নিজে টুকটাক কাজ করে।'

'তোমার বোন?'

'বেলা! বেলার কথা কী বলব?'

'যা ঠিক, তাই বলো।'

সুবোধ আবার জামার হাতায় মুখ মুছল, জিব চাটল। বলল, 'বেলাকে ছেলেবেলা থেকেই মা শাসনে রেখেছিল। বেলা দেখতে ভাল নয়, খারাপও নয়। তার চেহারা ছিল বাড়ন্ত। বেলা স্কুলে ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছিল। তার কাজ ছিল বাড়িতে বসে থাকা আর ঝি-গিরি করা। মা তাকে মারত, ধরত, গালাগালি দিত। বাবা বরং বেলার হয়ে লড়ত মার সঙ্গে। অনেকটা বড় হয়ে একদিন বেলা মার সঙ্গে চুলোচুলি করল। বিচ্ছিরি ঝগড়া। মা বেলার পিঠে ছেঁকা দিয়ে দিল খুন্তির। বেলা মার কনুই মচকে দিল। সে যে কী কাণ্ড ঘটল—বুঝতে পারবেন না। বেলা উনিশ নম্বর

বস্তিতে তার বন্ধু কাঞ্চনের বাড়িতে গিয়ে থাকল দু রাত। এরপর থেকে মা ঠাণ্ডা। আর কিছু বলত না।'

সুবোধের গলা আরও জড়িয়ে আসছিল। টেনে টেনে ধীরে ধীরে কথা বলছে। আলস্য যেন তাকে গভীর করে গ্রাস করছে।

'তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, চোখ বুজে আসছে।'

'এই টেবিলে এসে শুয়ে পড়ো।'

'আমাকে আর কতক্ষণ আটকে রাখবেন?'

'কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত।'

'আমি পারছি না।'

'পারবে।'

সুবোধ উঠল। তার পা টলল না। তবু ঘুমঘুম অলসভাবে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। আমি সরে গেলাম। পায়ের চটি খুলে সুবোধ টেবিলে উঠল। শুয়ে পড়ল।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, 'তোমার বোন বেলা কবে থেকে ধূপ আচার বিক্রি করতে শুরু করল?'

'আজ বছর তিন করছে।'

'ও বিয়ে করেছিল?'

'আপনি তাও জানেন?···হ্যাঁ, ও একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করেছিল লুকিয়ে। কালীঘাটে গিয়ে। আমাদের বলেনি। আমরা জানতাম না। সেই ছেলেটা, বাচ্চু, গাড়ির মাল চুরির লাইনে ছিল। গাড়ির টায়ার, রিম। ব্যাটারি···টপাটপ সরাতে পারত। মল্লিকবাজার থেকে পয়সা পেত ভাল। একবার বাবার সিনেমা হাউসের কাছে গাড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বেদম মার খায়। বাবা দেখেছিল। বাচ্চুকে এত মেরেছিল সবাই যে হাসপাতালে সে মারা গেল। তার পেচ্ছাপের থলে ফাটিয়ে দিয়েছিল

মেরে। বেলা তখন কান্নাকাটি করত। আমরা সেই সময় জানতে পারি।'

'তা তুমি বোমা ছোঁড়া, ছুরি মারাটা কবে শিখলে?'

সুবোধ শুয়ে শুয়ে মাথা নাড়ল। 'আমি বোমা ছুঁড়তে জানি না।'

'জান না? বেশ···।' আমি তার মাথার কাছে সরে এলাম। হাতে সেই চকচকে যন্ত্র। চোখে ফেলব?

সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। 'না।' তার সারা মুখে আতঙ্ক। 'না।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমার জাংয়ের কাছে ওই দাগটা বোমার স্প্লিনটারের। তোমার ওই পায়ের কড়ে আঙুল নেই।'

মাথা দোলালো সুবোধ। 'হ্যাঁ।'

শুয়ে পড়ো। আমায় ঠকাবার চেষ্টা করো না।'

সুবোধ শুয়ে পড়ল।

'এবার বলো।

সুবোধ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল। 'আমার যখন কিছুই হচ্ছিল না, একটা বেয়ারার চাকরিও নয়, তখন আমি সিঁথির ছোট বাজারে মাছ বিক্রি করব ঠিক করে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পুঁজি নিয়ে নেমে পড়লাম। দমদম মাছপট্টি থেকে কাদাচিংড়ি কিনে আনতাম আর বাজারে বসে বেচতাম। মাসখানেক পরে একটু পুঁজি বাড়ল। সকাল চারটে নাগাদ এক বন্ধুর ঝড়ঝড়ে পুরোনো সাইকেল নিয়ে দমদম স্টেশনে মাছ আনতে যেতাম। একদিন গলির মধ্যে আমায় আটকে গুণ্ডারা টাকাপয়সা কেড়ে নিল। আমি লড়তে গেলাম, শালারা আমায় বোমা মারল। জখম হয়েছিলাম। হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।'

'তখন তুমি মিথ্যে বলেছিলে।'

'হ্যাঁ। সত্যি বলে কী লাভ, স্যার। ···হাসপাতালে থেকে

ছাড়া পেয়ে আমি অন্য রকম হয়ে গেলাম। সবাই দেখি হারামি। দশ আনা ছ' আনা। তো আমিও হয়ে গেলাম। শয়তানদের সঙ্গে লড়তে হলে শয়তান হতে হয়।'

'তোমার বোন বেলার সঙ্গে যে ছেলেটা ঘুরত, তাকে তুমি ছোরা মেরেছ?'

'না সত্যি না। মারতে গিয়েছি। পারিনি। শালার কপাল ভাল বেঁচে গেছে।'

'কেন তাকে মারতে গিয়েছিলে?'

'কেন? কেন আপনি বুঝছেন না? আমার বোনকে সে অন্য পাঁচটা ধূপ-বেচা মেয়ের সঙ্গে টুকরির মাল করে নিয়েছিল। সারা দিন ধূপ বেচলে কমিসন বাবদ তিনটাকা। সে-শালার সঙ্গে ঘুরলে ফিরলে দশ পনেরো। চাই কি বিশ। ওই শালা শুয়োরের বাচ্চা আমার বোনকে নাসিং হোমে রেখে···।'

'তোমার বোনেরও তো দোষ আছে।'

'এক হাতে তালি বাজে না স্যার জানি। আমাদের দোষ আছে। কুকুরের দোষ। আর আপনাদের শুধু গুণ···। আরে, ওটা কী করছেন?'

'তোমার কাটা কড়ে আঙুলের জায়গাটা দেখছি। পুরো বাদ দিতে হয়েছে। গ্যাংগ্রীণ হয়ে গিয়েছিল নাকি?'

সুবোধ আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা ডান পা তুলে লাথি মারল। মুখে। তার লাথিটা আমার থুতনি, দাঁত, নাকে লাগল। বেশ জোরে।

আমার লেগেছিল। চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম। যন্ত্রণা হচ্ছিল নাক আর দাঁতে।

সুবোধ টেবিলের ওপর উঠে বসেছে ততক্ষণে। আমায় দেখছিল।

আমার নাক দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়তে লাগল। ওপর ঠোঁট ভিজে নিচের ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ল।

সুবোধ বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম—আপনি কোনো চালাকি করছেন। ওই কাটা জায়গাটায় আমার খুব ব্যথা। এখনও। ভীষণ কষ্ট হয়।'

রুমাল বার করে নাক-মুখ চাপতে চাপতে চাপতে আমি মাথা নাড়লাম। আস্তে। বলতে চাইলাম, জানি; আমারও হয়। সুবোধ বুঝল কিনা কে জানে।

———